স্কয়ার

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী

২০ তম
বর্ষ ২০১৮

- হেপাটাইটিস সি
- বর্ষাকালে ত্বকের যত্ন
- শিশুদের ক্ষুধামন্দা
- ব্যথার ওষুধ ও পেপটিক আলসার
- নিরাপদ মাতৃত্ব

ISSN 1682-0541

স্কয়ার
ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
বাংলাদেশ

CERTIFIED ISO 9001 COMPANY

সূচী

হেপাটাইটিস সি ০১
বর্ষাকালে ত্বকের যত্ন ০৩
শিশুদের ক্ষুধামন্দা ০৪
ব্যথার ওষুধ ও পেপটিক আলসার ০৬
নিরাপদ মাতৃত্ব ০৭
কয়েকটি ওষুধের ব্যবহার ও বিধিনিষেধ ১৫

২০তম বর্ষ, ২০১৮

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ

২০১৮ সালের স্বাস্থ্য ও ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী “স্কয়ার” যথাসময়ে আপনার হাতে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এ সংখ্যায় আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন স্বাস্থ্য সমস্যা তুলে ধরেছি যেগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের মোকাবেলা করতে হয়। বর্তমান সমাজে সচেতনতা বাড়ানোর জন্যই আমাদের এ প্রয়াস।

আশাকরি, এ সংখ্যায় প্রকাশিত বিষয়গুলো আপনাদের কাজে আসবে। আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানালে খুশি হব।

সবশেষে, “স্কয়ার” পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ জীবন কামনা করছি।

শুভেচ্ছাসহ

ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

নির্বাহী সম্পাদক
ডাঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান সিকদার

সহযোগী সম্পাদকমন্ডলী
ডাঃ এ এস এম শওকত আলী
ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি রায় চৌধুরী
ডাঃ রেজাউল হাসান খান
ডাঃ রুবাইয়াত আদনান

সহযোগিতায়
প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ISSN 1682-0541
Key title: Skayara

হেপাটাইটিস সি

শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল লিভার বা যকৃত। মানব দেহের প্রায়েজনীয় খাদ্য উপাদান গুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ, রক্ত বিশুদ্ধকরণ ও অন্যান্য অনেক বিশেষ কাজের পাশাপাশি ইহা রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। লিভার বা যকৃতের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলে। হেপাটাইটিস হলে ইহার যাবতীয় কাজ কর্মে বেঘাত সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত অ্যালকহল বা মদপান করা, বিষাক্ত পাদার্থ, কিছু কিছু ওষুধ এবং শরীরের অন্যান্য রোগের কারণেও হেপাটাইটিস হতে পারে।

তবে হেপাটাইটিসের অন্যতম প্রধান কারণ হল হেপাটাইটিস ভাইরাস। হেপাটাইটিস ভাইরাস পাঁচ ধরনের হয়ে থাকেঃ হেপাটাইটিস 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি' এবং 'ই'। এদের যে কোনটি দ্বারা লিভার আক্রান্ত হলে রোগটি মহামারির আকার ধারন করতে পারে। তবে 'বি' এবং 'সি' দ্বারা আক্রান্ত হলে হেপাটাইটিস দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং পরবর্তীতে লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। সারা বিশ্বে ৭১ মিলিয়ন মানুষ দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস সি রোগে আক্রান্ত এবং প্রতিবছর প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ হেপাটাইটিস সি এর কারণে লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সার এর জন্য মারা যায়।

হেপাটাইটিস সি ভাইরাস (HCV) লিভারের তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী দুই ধরনের সংক্রমন করে থাকে। তীব্র হেপাটাইটিসে সাধারনত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না কিন্তু একপর্যায়ে ইহা জীবনের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ১৫ থেকে ৪৫ ভাগ রোগী কোন রকম চিকিৎসা ছাড়া পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে এমনিতেই ভাল হয়ে যায়।

অবশিষ্ট ৬০ থেকে ৮০ ভাগ রোগী দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিসে পরিণত হয় এবং পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে এই রোগীদের লিভার সিরোসিস হওয়ার ঝুঁকি শতকরা ১৫ থেকে ৩০ ভাগ বেড়ে যায়।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই হেপাটাইটিস সি দ্বারা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় ও ইউরোপীয় অঞ্চলে এই রোগটি বেশী দেখা যায় যা যথাক্রমে শতকরা ২.৩ ভাগ এবং ১.৫ ভাগ।

পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় এই সংখ্যা শতকরা ০.৫ ভাগ থেকে ১ ভাগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতানুযায়ী ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী ১.৭৫ মিলিয়ন নতুন হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের সংক্রমন পাওয়া গেছে।

হেপাটাইটিস সি ভাইরাস সাধারনত রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়ে থাকে। যে সকল উপায়ে ইহা সংক্রমন করে তা হলঃ

- ব্যবহার করা সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে কোন ওষুধ বা মাদক নেয়ার সময়।
- পুনরায় ব্যবহার যোগ্য সিরিঞ্জ ও নিডল পর্যাপ্ত জীবানুমুক্ত না হলে।
- অপরিশোধিত রক্ত ও রক্তের উপাদান পরিসংক্রমনের মাধ্যমে।
- যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা কম। রোগাক্রান্ত মা থেকে তার শিশুর হবার সম্ভাবনাও কম। তবে মনে রাখতে হবে, হেপাটাইটিস সি ভাইরাস মায়ের বুকের দুধ, খাবার কিংবা পানির মাধ্যমে ছড়ায় না।

লক্ষণঃ

সংক্রমনের পর হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের লক্ষণ গুলো প্রকাশ পেতে ২ সপ্তাহ থেকে ৬ মাস সময় লেগে যায়। তবে শতকরা ৮০ ভাগ রোগীর কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যাদের প্রকাশ পায় তাদের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ ঃ

- জ্বর
- ক্লান্তিভাব
- ক্ষুধামন্দাও খাবারে অরুচি
- বমি বমি ভাব ও বমি
- পেট ব্যথা
- প্রস্রাব গাঢ় হয়ে যাওয়া
- ধুসর রঙের পায়খানা
- হাড় জোড়ায় ব্যথা
- সামান্য থেকে মাঝারি মানের জন্ডিস।

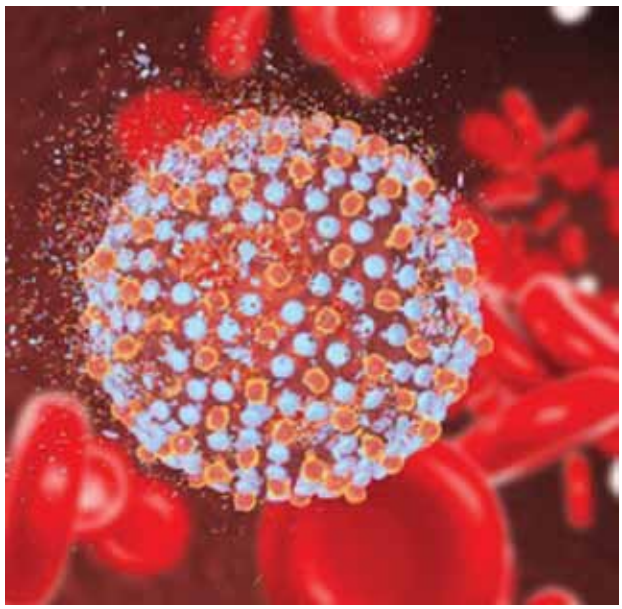

রোগ নির্ণয়ঃ

লিভার মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ না হলে যেহেতু রোগটির কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না তাই শুরুতেই রোগটি নিরূপন করা কঠিন। দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস সি এর ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের জন্য দুইটি পরীক্ষা করা জরুরী ঃ

- এন্টি হেপাটাইটিস সি ভাইরাস এন্টি বডি (Anti HCV)।
- উপরের পরীক্ষাটি পজিটিভ হলে HCV RNA করতে হবে দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস সি নিশ্চিত হবার জন্য।

দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস সি নিশ্চিত হলে লিভার ফাইব্রোসিস (Fibrosis) বা সিরোসিস (Cirrhosis) হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য লিভার বায়োপ্সি (Liver biopsy) করতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে যে সকল মানুষদের হেপাটাইটিস সি ভাইরাস নির্ণয়ের আওতায় আনা উচিৎ তারা হল ঃ

- মাদকসেবী (যারা ইঞ্জেকশন নেয়)
- যারা নাক দিয়ে মাদক গ্রহন করে
- রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মী

- ❒ HCV আক্রান্ত মায়ের সন্তান
- ❒ HCV আক্রান্ত যৌন সঙ্গী
- ❒ HCV আক্রান্ত ব্যক্তি
- ❒ হেমোডায়ালাইসিস করতে হয় এমন কিডনী রোগী।
- ❒ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জগুলো নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ❒ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ধারালো যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ডিসপোজাল করা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিরাপদ করা।

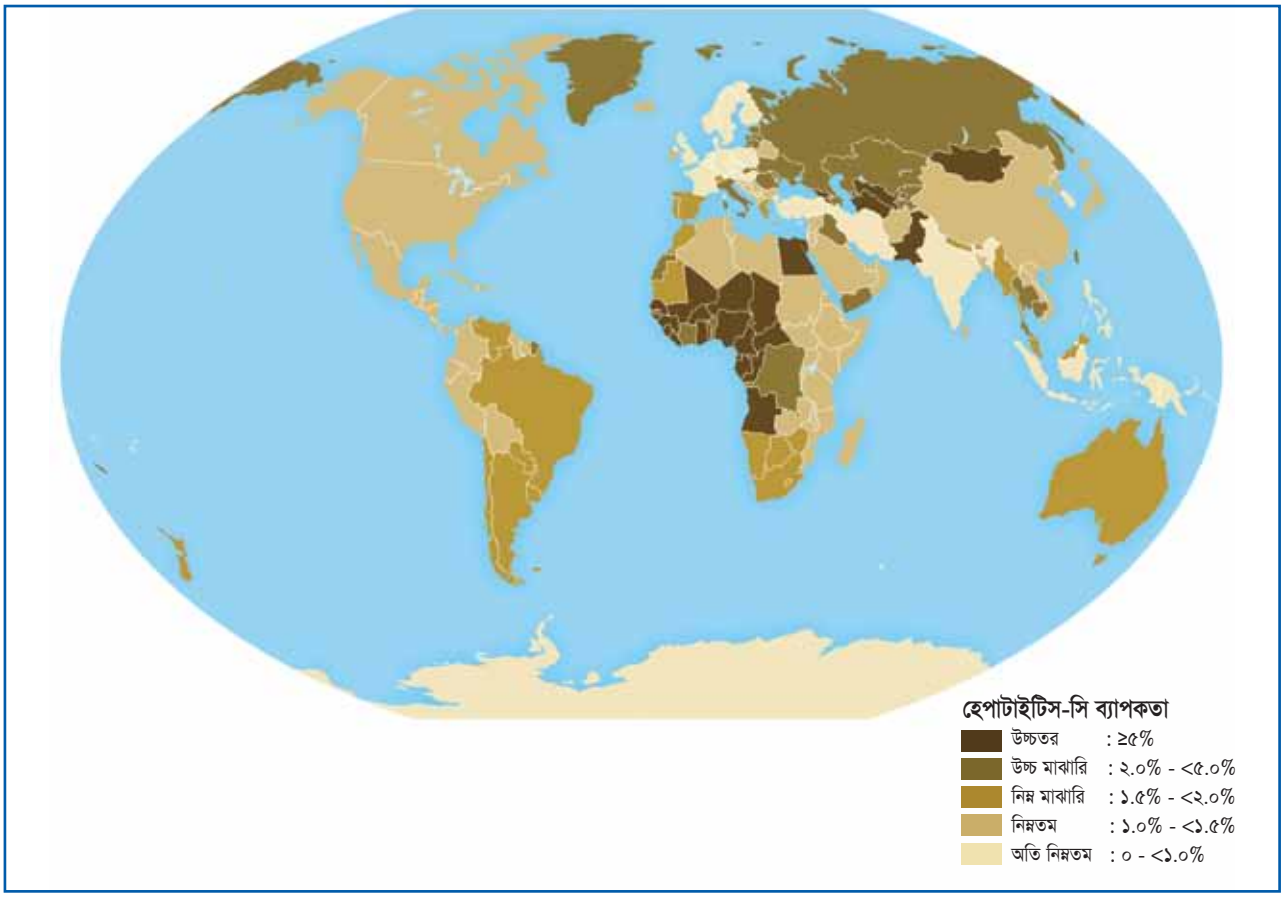

চিকিৎসাঃ

হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের সংক্রমনের জন্য সাধারনত কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। যাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যত বেশী তাদের ততো তাড়াতাড়ি এই সংক্রমনটি ভাল হয়ে যায়। তবে দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস সি সংক্রমনের জন্য যথোপযুক্ত এন্টিভাইরাল ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করলে রোগটি ভাল হয়ে যায়।

প্রতিরোধঃ

প্রতিষেধকের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। হেপাটাইটিস সি এর জন্য কোন ভ্যাকসিন আবিস্কৃত হয়নি। কাজেই ভাইরাসটি যাতে সংক্রমন না করতে পারে সেদিকে নজর দেয়াই উত্তম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চিকিৎসা সেবাদান কেন্দ্র এবং অতি ঝুকিপূর্ন লোকজনের জন্য হেপাটাইটিস সি প্রতিরোধের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রনয়ন করেছে। উদাহরন স্বরূপঃ

- ❒ হাতের স্বাস্থ্যবিধি বিশেষ করে কোন অপারেশনের পূর্বে সঠিকভাবে হাত ধুয়ে গ্লাভস পরিধান করা।
- ❒ ইঞ্জেকশন প্রদান ও এর যাবতীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের একটি সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা নিশ্চিত করা।
- ❒ রক্তদানের মাধ্যমে সংগৃহীত রক্তের HBV, HCV, HIV এবং সিফিলিস এর পরীক্ষা করা।
- ❒ স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

যারা হেপাটাইটিস সি দ্বারা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত তাদের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গুলো হলঃ

- ❒ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সচেতনতায় যত্নবান হওয়ার জন্য সঠিক শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদান করা।
- ❒ HAV ও HBV এবং সংক্রমন ও এদের হাত থেকে লিভার সুরক্ষিত রাখার জন্য ভ্যাকসিন নেওয়া।
- ❒ সঠিক মাত্রার ও যথোপযুক্ত এন্টিভাইরাল ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহন করা।
- ❒ যত দ্রুত সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী লিভার রোগটি নির্ণয় করা।

তথ্যসূত্র

❒ স্কয়ার

বর্ষাকালে ত্বকের যত্ন

বর্ষা মানেই যখন-তখন বৃষ্টি। এসময় খুব গরম যেমন থাকে আবার বাতাসে আদ্রতাও বেশি থাকে। তাই এ আবহাওয়ার সাথে আমাদের ত্বক ও চুল সহজেই মানিয়ে উঠতে পারে না। ফলে ত্বক ও চুল নিস্তেজ ও রুক্ষ হয়ে যায়।

আর তাই এ বর্ষায় ত্বকের প্রয়োজন অতিরিক্ত যত্ন। ত্বক সুন্দর রাখার কিছু উপায় দেখে নিন-

ত্বকের যত্ন:

সারাবছরই ত্বকের যত্নে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিৎ। তৈলাক্ত ত্বকে পানির মাত্রা বেশি থেকে। তাই সানস্ক্রিনের এসপিএফ (সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর) অবশ্যই ৩০ মাত্রার অধিক ব্যবহার করবেন। রুক্ষ ও শুষ্ক ত্বকের জন্য এসপিএফ ৩০ মাত্রার অধিক সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। সাধারণ ত্বকের জন্য ৩০ থেকে ৫০ এসপিএফ মাত্রায় সানস্ক্রিন ভালো কাজ করে।

হাতের যত্ন:

বৃষ্টিতে ভিজলে প্রথমেই হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে অন্তত একদিন নিয়মিত ম্যানিকিওর করুন। হালকা গরম পানিতে বেবি শ্যাম্পু মিশিয়ে নিন। এতে হাত ভিজিয়ে রাখুন ৫ থেকে ১০ মিনিট। এরপর ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিন নখ ও এর আশপাশের অংশ। পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার মাখুন। নখ চকচকে করতে বাফার ঘষে নিতে পারেন। নখে যদি হলুদ ছোপ থাকে তাহলে ম্যাসাজ করুন লেবুর রস দিয়ে।

পায়ের যত্ন:

বর্ষা মৌসুমে রাস্তায় জমে থাকা পানির সঙ্গে নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ মিশে যায়। আর এই পানি পায়ে লেগে বিভিন্ন ধরণের চর্মরোগ দেখা দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমন হতে পারে। এ সময় বাড়িতে ফিরে পা পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর গরম পানিতে কয়েক দানা খাওয়ার সোডা মিশিয়ে পা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। এবার লবণ বা চিনির উপাদান মিশ্রিত স্ক্র্যাব দিয়ে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পাতলা কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে পা মুছে ফেলুন। এরপর ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম বা লোশন দিয়ে ম্যাসাজ করুন।

ঠোঁটের যত্ন:

এ মৌসুমে ঠোঁট ফাটা বা ঠোঁটের চামড়া ওঠা খুবই সাধারণ ঘটনা। বর্ষায় ঠোঁট নরম রাখতে ঠোঁটে লিপ বাম ব্যবহার করা উচিৎ। এতে ঠোঁটের নমনীয়তা বজায় থাকবে।

গরম, আর্দ্রতা ও ভ্যাপসা আবহাওয়ার এই সময়ে নানা ধরনের ছত্রাকের প্রকোপ বেড়ে যায়। এ ছাড়া আছে অতিরিক্ত ঘাম ও নানা ধরনের সংক্রমণের ভয়। বর্ষাকাল তাই ত্বকের জন্য খুব সুবিধার নয়।

দেহের ভাজে ভাজে ও যেসব জায়গা বেশি ঘামে বা বেশি তপ্ত হয়, যেমন- উরু বা বগলের ভাজে, স্তনের নিচে, পশ্চাদ্দেশে ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের আক্রমণ বেশি হয়। এতে চুলকানির সঙ্গে লালচে দাগ দেখা যায়। খালি পায়ে কাদা পানি বা নোংরা পানিতে হাঁটলে পায়ের তলায় বা আঙুলের ফাঁকে ছত্রাক জন্মাতে পারে। একে সাধারণ বাংলায় হাজা বা পচা পা বলে। বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা এসব সমস্যায় বেশি ভোগেন।

বর্ষায় কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ব্রণের আক্রমণও বাড়ে। মুখের ত্বক তৈলাক্ত হওয়া ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে ব্রণ পেকে ফুসকুড়ির মতো হয়ে পড়তে পারে। বর্ষাকালে প্রকৃতিতে মশা-মাছি ও নানা প্রকার পোকামাকড়ের উপদ্রবও বেশি। আর এ থেকে অ্যালার্জি, ত্বকে ফোসকা পড়া বা লাল দানা হওয়ার সমস্যাও প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষ করে শিশুদের।

মেকআপ এড়িয়ে চলুন

বর্ষাকালে যতটা সম্ভব মেকআপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। তা না হলে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

ফেসিয়াল

স্বাস্থ্যকর ত্বক পেতে সপ্তাহে অন্তত একবার এক্সফ্লোয়েশন করার চেষ্টা করুন। এতে শুধু ত্বকের মরা চামড়াই দূর হবে না, একইসঙ্গে ভেতর থেকেও ত্বক পরিষ্কার থাকবে।

শাকসব্জি ও ফলমূল

বর্ষার সময় ত্বকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রচুর পানি পান করুন। একইসঙ্গে নানা ধরনের ফলমূল ও সবজি বিশেষ করে আম, আনারস, বেল, কলা পেয়ারা, শসা, গাজর, পাতিলেবু ও জাম্বুরা প্রভৃতি খাওয়ার চেষ্টা করুন। এতে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি ত্বকের সুস্থতাও নিশ্চিত হবে।

চাই সচেতনতা

- এ সময় ভারী জামা-কাপড় না পরে হালকা রঙের সুতি পাতলা জামা পরুন। ঘামে ভিজে গেলে দ্রুত পাল্টে নিন। ভেজা কাপড় পরে থাকলে ছত্রাক সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি।
- নিয়মিত প্রয়োজনে দিনে দুবার গোসল করুন। জীবাণুনাশক সাবান ব্যবহার করতে পারেন। ঘামে বা বৃষ্টিতে ভিজলে ত্বক ধুয়ে শুকিয়ে নিন।
- এই সময় সারা দিন জুতা-মোজা না পড়ে বরং হালকা চপ্পল বা খোলা স্যান্ডেল পড়া ভালো। তবে খালি পায়ে হাঁটবেন না। রাস্তায় বর্ষায় নোংরা পানি জমে থাকে। পায়ের ত্বককে এই নোংরা পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। কেননা এই পানিতে রয়েছে হাজার রকমের জীবাণু।
- ভেজা চুল ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে তবে বাঁধবেন, নইলে মাথার ত্বকে সমস্যা হতে পারে।
- বাড়িতে কারও ছত্রাক সংক্রমণ হয়ে থাকলে শিশুদের তার কাছ থেকে দূরে রাখুন।

তথ্যসূত্র

- স্কয়ার

শিশুদের ক্ষুধামন্দা

সব শিশুদের মধ্যে একটা সাধারণ সমস্যা দেখা যায়। সেটা হলো শিশুর খেতে না চাওয়া। কোন কোন শিশু নিজের পছন্দের খাবার ছাড়া আর কিছুই খেতে চায় না। আবার কোন শিশু সব কিছুতেই নাক সিটকায়। কেউ আছে খায় বটে, তবে পুরো খাবার না খেয়েই উঠে পড়ে। মোট কথা, বেশির ভাগ বাচ্চারাই খাবার নিয়ে ঝামেলা করে। এটা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা।

শিশু খাবারের ওপর তার বৃদ্ধি, পুষ্টি-এসব বিষয় জড়িত। তাই কী কারণে শিশুটি খেতে চায় না এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা জরুরী। আজকাল বেশির ভাগ মায়েরাই বলতে থাকেন, ডাক্তার সাহেব আমার বাচ্চাটি খেতে চায় না কী করব? খেতে না চাওয়া সত্যি সত্যিই একটি বড় সমস্যা। আর তারাও যদি খেতে না চায়, মায়েরা নিশ্চয়ই চিন্তায় থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। এই বিষয়টি খুব গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে বাচ্চা ঠিক মতো বাড়ছে কিনা। সেজন্য নিয়মিত বাচ্চার ওজন দেখতে হবে। তার উচ্চতা ঠিক আছে কি না, তার বয়সে অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় বৃদ্ধি ঠিকমতো হচ্ছে কি না। বাচ্চার মাইলস্টোন ডেভেলপমেন্ট যেমন- খেলাধুলা, চালচলন কার্যক্রম সব ঠিক আছে কি না- এসব দেখতে হবে। বয়স অনুযায়ী মানসিক ও শারীরিক বিকাশ অন্য বাচ্চাদের মতো হলে শিশুর খাওয়া নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

শিশু কেন খেতে চায় না?

কিছু কিছু রোগের কারণে শিশুদের রুচি কমে যেতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অত জটিল কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে মা-বাবার উৎকণ্ঠা বেশি থাকে। হয়তো শিশু তার রুচি ও পরিমাণ অনুযায়ী ঠিকই খাচ্ছে, কিন্তু মা-বাবা তাতে তৃপ্ত হচ্ছেন না। শিশুর আসলে কোনো রোগ নেই, সমস্যাটা তার মনে।

শিশুর খাবার না খেতে চাওয়ার পেছনে অনেক সময় সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার কাজ করে। যেসব বাচ্চার মা অতিরিক্ত আদর বা শাসন করে, বাচ্চাদের মধ্যে খাবার নিয়ে ঝামেলা করার প্রবণতা তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। শিশুর প্রতি মনোযোগ কমে গেলেও সে খাওয়া কমিয়ে দিতে পারে। সে যখন দেখে যে ঠিক মতো না খেলে বা খাবার নিয়ে যন্ত্রণা করলে তাকে নিয়ে সবাই অস্থির হয়ে পড়ছে, তখন খাবার নিয়ে বায়না ধরে। যে সব শিশুদের ঘন ঘন মুড পরিবর্তন হয়, তারা খাবার নিয়ে সমস্যা করে বেশি। নিজের স্বাধীন মেজাজ বোঝানোর জন্য বা বজায় রাখার জন্য অনেক শিশু খাবার নিয়ে বায়না ও জেদ করতে থাকে। ছোট শিশুদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বেশ স্পর্শকাতর। খাবারের গন্ধ এবং রং যদি ভালো না হয় বাচ্চারা সে খাবার খেতে চায় না, মুখ থেকে ফেলে দেয়। অনেক সময় শরীরের জিন ঘটিত কারণে কিছু কিছু খাবারের গন্ধ বা স্বাদ বাচ্চারা সহ্য করতে পারে না। এর ফলে তারা সব ধরনের খাবার খেতে চায় না।

হজম প্রক্রিয়াতে সমস্যা থাকায় অনেক বাচ্চার খিদে এবং খাবার ইচ্ছা থাকে না। এ কারণেও অনেক বাচ্চা খাবার নিয়ে বায়না করতে পারে। অনেক মা শিশুকে নিয়ম মাফিক খাওয়ানোর মাঝে কান্না মাত্রই মায়ের দুধ খাওয়ান বা অন্যান্য খাবার খাওয়ান। এ অনিয়মিত খাবারের কারণে শিশুর খাবারের রুচি ও ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে খাবার খেতে অনীহা প্রকাশ করে। কোনো কোনো বাড়িতে শিশু নিজের খাবার সময় ছাড়া অন্য সময়ও পরিবারের অন্য সদস্য বা আত্মীয়স্বজন সবার সঙ্গে খায়। আবার অনেক মা তার শিশু সাত টার সময় পেট ভরে খায়নি বলে আট টার সময় তাকে আরেকবার খাবার দেন, নয় টার সময় আবার চেষ্টা করেন এবং এমনিভাবে সারা দিন ধরেই প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এসব অভ্যাসই শিশুর খাবারের প্রতি অনীহা তৈরি করে।

তবে কিছু বাচ্চা আছে যারা, সত্যি সত্যি খেতে চায় না। বৃদ্ধিটাও ঠিক মতো হয় না। তাহলে দেখতে হবে যে বাচ্চাটি অপুষ্টির শিকার হচ্ছে কিনা বা তার রক্তশূন্যতা হয়েছে কি না ? না কি বাচ্চার ঘন ঘন কোনো সংক্রমণ হচ্ছে, যার জন্য খাওয়ায় রুচি কমে যাচ্ছে। যদি শিশুটির রক্তশূন্যতা থাকে, অপুষ্টি থাকে তাহলে শিশুটি খুব বেশি সচল থাকবে না। পাশাপাশি কৃমি আছে কি না দেখতে হবে। কিছু বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া, অ্যাজমা থাকতে পারে, কিংবা প্রস্রাবে সংক্রমণ থাকতে পারে, তখন বাচ্চাটিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বাচ্চার না খাওয়ার কারনগুলো খুঁজতে হবে। শুধুই কি ক্ষুধামন্দা নাকি সঙ্গে আরো কিছু রয়েছে, সেসব দেখতে হবে। দেখে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে।

বাচ্চাকে জোর করে খাওয়ানোর কুফল

প্রায়শই দেখা যায় যে বাবা মায়েরা ছেলে মেয়েদের বেশি করে খাওয়াতে চান বা ওদের জোর করে, যাতে ওরা প্লেটে খাবার ফেলে না রাখে। বাবা মায়েরা এগুলো বাচ্চাদের ভালোর জন্যই করে কিন্তু অসুবিধা হল এইভাবে জোর করে খাওয়ানোর ফলে বাচ্চারা নিজেদের শরীরের প্রয়োজন এবং ক্ষুধা নিজেরাই বুঝতে পারে না। বাচ্চারা এর ফলে খাবারকে হোমটাস্কের মত করে গিলতে শুরু করে। অথচ খুব দরকারি হচ্ছে ভালবেসে খাবার খাওয়া, জোর করে গিলে নয়। আর এমন ভাবে জোর করে খাওয়ালে বাচ্চার ওজনও বাড়বে না আর ব্যাপারটা স্বাস্থ্যকরও নয়।

গবেষণায় বলা হয়, জোর করে খাওয়ানো হলে বরং ভালোর চেয়ে মন্দটাই বেশি হতে পারে। জোর করে খাওয়ানোতে কোনো উপকার হয় না বললেই চলে। এতে শিশুর স্বাভাবিক খাওয়ার অভ্যাস বাধাগ্রস্থ হয় এবং অস্বাস্থ্যকর ওজন বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে। বাচ্চার নিজের যদি খাওয়ার ইচ্ছে না থাকে, সেক্ষেত্রে জোর করা উচিৎ নয়। বরং, জোর করে খাওয়ালে বাচ্চারা মুখের মধ্যেই অনেক সময় খাবার রেখে দেয়। সেই খাবার গলায় আটকে যাবার ভয় থাকে।

এমনকি, শ্বাস নিতেও অসুবিধা দেখা দিতে পারে। জোর করে খাওয়ালে বাচ্চা সঠিক পুষ্টি পায়না। তাই বাচ্চা যাতে সঠিক পুষ্টি পায়, তার জন্য তাকে নিজ থেকেই খেতে দেয়া উচিৎ।

অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও খাবার খাওয়ালে বাচ্চারা অনেক সময় বমি করে দেয়। এতে বাচ্চার শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। জোর করে খাবার খাওয়ালে বাচ্চার মনে তা নিয়ে ভয় সৃষ্টি হতে পারে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিশুর বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে সমস্যা হয়, কখনো বা তারা ওজন হারাতে থাকে। বার বার খাবারের জন্য তাগিদ দিলে শিশু খাবারের প্রতি অনীহা দেখাবে। খাবার নিয়ে একবার জোর করে খাওয়ালে পরে যখনই তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হবে, তখন সে ভয়ে আরোও খাবে না। খাওয়ার প্রতি তার কোনো উৎসাহ থাকবে না।

সবার খাবার হোক বাচ্চারও খাবার

আমরা অনেক বাচ্চাকে আলাদাভাবে খেতে দিই। পরিবারের লোকজন যখন যা খায় তাদের সঙ্গেই যদি বাচ্চাকে বসাই, সবার খাওয়াটা সে দেখবে। তখন তার নিজে নিজে খাওয়ার অভ্যাস হবে। আসলে বাচ্চা যখন ছোট থাকে, তখন আমরা পরিবারের যে খাবারটুকু খাই সেটাই বাচ্চাকে একটু নরম করে দিতে হবে। তার জন্য অনেকে বলেন, খাবার ব্ল্যান্ডারে পিষে স্যুপ করে দিতে। এগুলো তেমন দরকার নেই। এর মধ্যে শাকসব্জি, মাছ, মাংস- আমরা যেটা খাই সেটাই দেব। কিন্তু খুব লবণ বা খুব ঝাল দেয়া যাবে না। বাচ্চা যাতে খেতে পছন্দ করে এমন রঙিন করে দিতে হবে, যেন দেখে বাচ্চা খেতে চায়। এভাবে তাকে যতটুকু দরকার ততটুকু খাওয়ানো উচিৎ।

বাচ্চার যদি অনেক খেলনা থাকে, তার মনও খেলনার দিকে চলে যায়। অনেক সময় আমাদের এগুলো ব্যবহার করতে হয়। তবে খুব বেশি খেলনা ব্যবহার করা উচিৎ নয়, এতে মনোযোগ ভিন্ন দিকে চলে যায়। এটি খাওয়ার আগ্রহ কমিয়ে দেয়। বাচ্চার বয়স অনুযায়ী সে যদি ঠিকমতো বড় হয়, ওজন ঠিকমতো থাকে, তার যদি বৃদ্ধি, কাজকর্ম ঠিক থাকে তাহলে এতো চিন্তার কিছু নেই।

খাবার নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে আচরণগত পরিবর্তন আনা উচিৎ

ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ঘুম থেকে উঠেই খিচুড়ি বা অন্য খাবার না দিয়ে আগে বুকের দুধ দিতে হবে। এর দুই-তিন ঘন্টা পর অন্য খাবার দিতে হবে। শিশুকে যখন-তখন চিপস, জুস, চকলেট ইত্যাদি দেয়া যাবে না, এতে খিদে নষ্ট হয়। আহারের মধ্যবর্তী সময়গুলোতে শিশুকে অন্যান্য খাবার বেশি দেয়া যাবে না। যেমন ভাত খাওয়ার দুই ঘন্টা আগে দুধ বা নাশতা দেয়া যাবে না। শিশুর বিদ্যালয় যদি দুপুর ১২টায় ছুটি হয়, তবে ফিরে এসে তেমন কোনো নাশতা না দেয়াই উচিৎ। এক্ষেত্রে ক্ষুধা থাকা অবস্থাতেই ভাত বা মধ্যাহ্নভোজ দিয়ে দেয়া যায়। শিশুকে এক খাবার প্রতিদিন না দেয়াই ভাল। যেমন রোজ ডিম সেদ্ধ না দিয়ে ডিমের তৈরি নানা জিনিস যেমন পুডিং, জর্দা ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে। দুধের ক্ষেত্রেও তাই; পুডিং, সেমাই বা পায়েসে প্রচুর দুধ থাকে, সেটাই যথেষ্ট। ফল খেতে না চাইলে কাস্টার্ড করে দেয়া যায়। অনেক সময় খাবার পারিবেশনেও ভিন্নতা থাকলে কাজ হয়।

রঙিন পাত্রে খবার পরিবেশন করতে হবে। টেবিলকে করুন সুন্দর ও আকর্ষণীয়। টিভি দেখা কমিয়ে পর্যাপ্ত খেলার ব্যবস্থা করুন, এতে ক্ষুধা বাড়বে। দেখা গেছে, শিশু যদি একা খায়, তাহলে সে খুব বেশি খেতে চায় না। কিন্তু যদি স্বপরিবারে বসে এক সঙ্গে খায়, তাহলে শিশুটিও খেতে উৎসাহ পাবে। তাই দুপুরের খাবার বা রাতের খাবার সবাই একসঙ্গে করা ভাল। শিশু যদি খুব অন্য মনস্ক থাকে, তাহলে খিদে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- শিশুর বন্ধুরা যখন সবাই বাইরে খেলাধুলা করছে, তখন শিশুটিকে জোর করে বাড়ির মধ্যে রেখে তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করলে, শিশুটি একেবারেই খেতে অনীহা দেখাবে।

পরিশিষ্ট

বাচ্চার খাবারের ক্ষেত্রে এসব দিক লক্ষ্য রাখার সাথে সাথে সন্তান ঠিক মতো বাড়ে কিনা, তাও নজরে রাখতে হবে। যদি দেখা যায় যে বাচ্চা সমবয়সীদের মতোই বাড়ছে, ওজনও ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে হবে তার শরীরে পুষ্টির কোনো ঘাটতি নেই, অর্থাৎ শিশুর খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিকই আছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, বাচ্চার ওজন বয়সের তুলনায় বেশি অথচ মা-বাবার অভিযোগ শিশুটি একদমই খায় না। এধরনের পরিস্থিতিতে মা-বাবাকে বুঝতে হবে যে শিশু যদি ঠিকমত না খেত, তাহলে তা শিশুটির জন্য অন্যান্য ক্ষতির কারন হতো। যদি দেখা যায় যে বাচ্চা ঠিকমত বাড়ছে না, বয়সের তুলনায় ওজন অনেক কম অথবা বয়সের তুলনায় ওজন অনেক বেশি তাহলে কোন শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

গ্যাস্ট্রিক আলসার নামটির সঙ্গে পরিচিত নন এমন লোক খুঁজে বের করা হয়তো কঠিন। সাধারণত লোকজন গ্যাস্ট্রিক আলসার বলতে যা বুঝিয়ে থাকেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় পেপটিক আলসার।

পেপটিক আলসার যে শুধু পাকস্থলীতেই হয়ে থাকে তা কিন্তু নয়; পরিপাকতন্ত্রের যে সকল অংশে পেপটিক আলসার দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

১. অন্ননঅলীর নিচের প্রান্ত
২. পাকস্থলী।
৩. ডিওডেনামের বা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ।
৪. পরিপাকতন্ত্রের অপারেশনের পর যে অংশে জোড়া লাগানো হয় সে অংশে।

পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশ তথা আমাদের এ উপমহাদেশে এ রোগীর সংখ্যা খুবই বেশি। ধনীদের চেয়ে গরীব লোকদের এ রোগ বেশি দেখা যায়। তবে নারী পুরুষ প্রায় সমানভাবে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

পেপটিক আলসারের আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো দীর্ঘদিন ব্যাথার ওষুধ খাওয়া। ব্যাথার ওষুধ খালি পেটে খেলে কিংবা এই ওষুধের সাথে অ্যান্টাসিড বা রেনিটিডিন জাতীয় ওষুধ না খেলে পেপটিক আলসার হতে পারে। এসব ব্যথার ওষুধের মধ্যে রয়েছে প্যারাসিটামল, অ্যাস্পিরিন, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, ইন্ডোমেথাসিন, ফেনাইল বিউটাজন, স্টেরয়েড প্রভৃতি।

কিভাবে ব্যথার ওষুধ পেপটিক আলসার করে তার সব কারণ জানা না গেলেও বেশকিছু কারণ জানা গেছে। ব্যথার ওষুধ পাকস্থলী বা ডিওডেনামের মিউকোসাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ফলে আলসার হয়। ব্যথার ওষুধ গ্রহণ করলে প্রস্টাগ্লান্ডিন কমে যায়।

গবেষণায় দেখা গেছে ১০০ জন রোগীকে উচ্চমাত্রার ব্যথার বড়ি দেয়া হয়েছিল। বিভিন্ন অসুখ যেমনঃ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং অস্টিওআর্থ্রাইটিসের জন্য এ ব্যথার ওষুধ দেয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে মাত্র ১০ থেকে ২০ জনের পরবর্তীতে এন্ডোস্কোপি করে ক্ষত ধরা পড়েছিল। সুতরাং ব্যথার ওষুধ খেলে সবার আলসার হবে এ ধারণা সঠিক নয়।

ব্যথার ওষুধ গ্রহণ করলে যাদের মধ্যে আলসার হবার সম্ভাবনা বেশী তাদের মধ্যে আছে-

১. যাদের বয়স ৬৫ বছরের বেশী।
২. উচ্চ মাত্রায় যারা ব্যথার ওষুধ খান।
৩. ব্যথার ওষুধ ও স্টেরয়েড একত্রে খান।
৪. হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া দিয়ে যিনি আক্রান্ত।
৫. প্রতিদিন যদি ব্যথার ওষুধ খান।
৬. প্রতিদিন যদি স্বল্প মাত্রায় এসপিরিন গ্রহন করেন। এমনকি 'লো ডোজ' অর্থাৎ ৭৫ মিলিগ্রাম করেও যারা গ্রহণ করেন তাদেরও আলসার হবার সম্ভাবনা বেশী।
৭. ব্যথার ওষুধের সাথে যদি ক্লপিডগ্রেল এবং ওয়ারফেরিন জাতীয় ওষুধ খান।

রোগের উপসর্গ

পেপটিক আলসারের রোগীদের দীর্ঘকাল ব্যাপী ক্ষুধামন্দা থাকে। পেট ফাঁপা থাকতে পারে, বুক জ্বালাপোড়া সেই সাথে টক টক ডেকুর হতে পারে।

পেটে ব্যাথা পেপটিক আলসারের প্রধান লক্ষণ। ব্যথা সাধারণত পেটের উপরিভাগে হয়। অনেক সময় চিনচিনে যন্ত্রণা হয়। ডিওডেনাল আলসারের রোগীদের ব্যথা হয় খালিপেটে, শেষ রাতের দিকে ব্যথা বেড়ে যায়, পেটে জ্বালাপোড়া হয়।

গ্যাস্ট্রিক আলসারের রোগীরা খাবার খেতে ভয় পায়, কারণ খাবার খেলে তাদের ব্যথা বেড়ে যায় কিন্তু ডিওডেনাল আলসারের রোগীদের ক্ষেত্রে উল্টোটা ঘটে। এদের ক্ষুধা বেশি থাকে।

গ্যাস্ট্রিক আলসারের রোগীদের শরীরের ওজন কমে যায়, কিন্তু ডিওডেনাল আলসারের রোগীদের শরীরের ওজন কমে না বরং বেশি খাদ্য গ্রহনের জন্য ওজন অনেক সময় বেড়ে যায়।

কিভাবে রোগ নির্ণয় করা হয়

রোগ নির্ণয়ের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হল পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগে এনডোস্কপি করা। এ ক্ষেত্রে একটি সরু নলের মধ্যে, পাকস্থলী ও ডিওডেনামের ভেতরের অবস্থা সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায়। পাকস্থলী ও ডিওডেনামের ঝিল্লির স্বাভাবিক বর্ণ লালচে ও মখমলের মতো। কিন্তু আলসার হলে সেখানটা ফ্যাকাসে ও সাদা হয়ে যায়।

পেপটিক আলসারের রোগীর চিকিৎসা

পেপটিক আলসারের রোগীর চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাকে উপসর্গের হাত থেকে রেহাই দেয়া এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘা সেরে তোলা। পেপটিক আলসারের রোগীকে অবশ্যই রুটিনমাফিক শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করতে হবে এবং ঠিকমতো ওষুধ খেতে হবে।

ব্যথার ওষুধ থেকে যেন আলসার না হয় তার জন্য স্বল্পমাত্রার ব্যথার ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। একটানা খাওয়া যাবে না। মাঝে মাঝে খেতে হবে। ব্যথার ওষুধ খালি পেটে খাওয়া যাবে না।

ব্যথার ওষুধের সাথে স্বল্পমাত্রার অ্যান্টি আলাসারেন্ট ওষুধ খেতে হবে যা ব্যথার ওষুধের ক্ষতি থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

যেমন-

১. প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (ওমিপ্রাজল, রেবিপ্রাজল, ইসোমিপ্রাজল, প্যান্টোপ্রাজল, ল্যানসোপ্রাজল)।

২. এইচ-২ রিসেপ্টর ব্লকার (রেনিটিডিন, ফ্যামোটিডিন)।

শল্যচিকিৎসা

যে কারনে পেপটিক আলসারের রোগীর অপারেশন প্রয়োজন হয়, তা হল:

- যদি ওষুধের মাধ্যমে আলসার ভাল না হয়।
- যদি আলসারের কারণে রোগীর স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়।
- যদি আলসারের কারণে বিভিন্ন জটিলতা (যেমন অন্ত্র ফুটো হওয়া, অন্ত্রে প্রবেশের দ্বার সরু হওয়া, রক্তক্ষরণ হওয়া) দেখা দেয়।
- যদি ক্যান্সার সন্দেহ করা হয়।

পেপটিক আলসারে যে সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে:

১. পাকস্থলী ফুটো হয়ে যেতে পারে।
২. রক্ত বমি হতে পারে
৩. কালো পায়খানা হতে পারে।
৪. রক্তশূণ্যতা হতে পার।
৫. পরিপাক নালীর পথ সরু হয়ে যেতে পারে এবং রোগীর বার বার বমি হতে পারে।
৬. ক্যান্সার হতে পারে।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

নারীর চিরন্তন পরিচয় 'মা' এবং মা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শব্দ। বংশানুক্রম ধারা টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব প্রকৃতিগত ভাবেই বর্তেছে নারীর ওপর মাতৃত্বের মধ্যদিয়ে। একজন নারীর পূর্ণতা আসে মাতৃত্বে। এই মাতৃত্ব কতটুকু নিরাপদ? একটি পরিসংখ্যান মতে, প্রতিবছর সারাবিশ্বে ২১ কোটি নারী গর্ভবতী হয় এবং দুই কোটিরও বেশি নারী গর্ভজনিত স্বাস্থ্য-সমস্যায় ভোগে। এদের মধ্যে আবার আশি লাখ গর্ভবতী মায়ের বিভিন্ন কারণে জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। অত্যন্ত গরিব জনগোষ্ঠীর মধ্যে জটিলতায় ভোগার আশঙ্কা অপেক্ষা কৃত ধনীদের তুলনায় প্রায় ৩০০ গুণ বেশি। মূলত: গর্ভকালীন জটিলতা, দক্ষ স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর অনুপস্থিতি, প্রয়োজনীয় যত্নের অপ্রতুলতায় একজন মাকে ঠেলে দিচ্ছে সীমাহীন অনিশ্চয়তা, দুর্ভোগ আর কষ্টের মুখে। আমাদের দেশের বহু সংখ্যক নারী এখনো এসব অধিকার ও সেবা থেকে বঞ্চিত। একদিকে আছে অপ্রতুল চিকিৎসা সেবা, অন্যদিকে আছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা। পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায়, বাংলাদেশে শতকরা ৬৮ ভাগ গর্ভবতী নারী ১টি প্রসবপূর্ব সেবা এবং ২৬ ভাগ নারী ৪ টি প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণ করে থাকেন। গর্ভকালীন সময় শতকরা ১৫ জন নারীই নানা রকম ঝুঁকিপূর্ণ জটিলতায় ভোগেন, যা মাতৃ মৃত্যুর জন্য দায়ী। তাছাড়া কর্মজীবী নারীদের, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের গর্ভাবস্থা নিয়েই অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়। ফলে মা ও সন্তানের জীবন পড়ে যায় ঝুঁকির মুখে। অথচ গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতা এবং গর্ভপাতের কারণ সম্পর্কে একটু সচেতন হলেই এসব মায়ের অনেককেই বাঁচানো সম্ভব।

গর্ভসঞ্চারণ

প্রাথমিক উপসর্গ ও লক্ষণ

জরায়ুতে ভ্রুণের পরিবর্তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মায়ের শরীর ও মনে অনেক পরিবর্তন হয়। এসব পরিবর্তন দেখা দেয় মায়ের শরীরের নানা হরমোনের কাজের ফলে। গর্ভসঞ্চারণের ফলে যে সব পরিবর্তন দেখা যায় তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

১. অ্যামেনোরিয়া বা মাসিক বন্ধ হওয়াঃ সাধারণভাবে সুস্থ এবং নিয়মিত মাসিক হয় এমন প্রজননক্ষম মহিলার মাসিক হঠাৎ বন্ধ হলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা প্রথমে ভাবা হয়। যদিও প্রথম গর্ভসঞ্চারণের পরেও দু এক মাস সামান্য রক্তস্রাব দেখা দিতে পারে। মাসিক বন্ধ হওয়া গর্ভসঞ্চারণের একটা প্রধান লক্ষণ কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষণ নয়। কেননা, গর্ভসঞ্চারণ ছাড়াও নানবিধ কারণের ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া বা ঋতুস্রাবে গোলমাল হতে পারে।

২. বমি বা বমি বমি ভাবঃ বমি সাধারণত সকালের দিকেই হয়। প্রথম তিন মাসের পর এ উপসর্গ ক্রমশ কমে যায়। এ উপসর্গ সাধারণত মায়ের শরীরের খুব বেশি ক্ষতি করে না। তবে খাওয়া কমে যাওয়ার জন্য দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। বমি বা বমি বমি ভাব এ উপসর্গের সঙ্গে যদি নিয়মিত মাসিক বন্ধ থাকে তাহলে গর্ভসঞ্চারণ হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। তবে পাকস্থলীর কোনো কোনো অসুখেও এ ধরেনের সমস্যা হয় বলে শুধুমাত্র এই উপসর্গ দিয়ে গর্ভধারণ নিশ্চিত করা যায় না।

৩. ঘন ঘন প্রস্রাবঃ গর্ভসঞ্চারণের প্রথম দিকের আরো একটা লক্ষণ হলো স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ঘন ঘন প্রস্রাব করা। মূত্রাশয়ের ওপর জরায়ুর চাপ পড়ার ফলেই এমনটি হয় এবং এ অবস্থা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। গর্ভস্থায় শেষের দিকে গর্ভস্থ সন্তানের মাথা নিচে নামার সময় যখন মূত্রাশয়ের ওপর চাপ দেয় তখন আরো একবার এ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

৪. স্তনের পরিবর্তনঃ সাধারণত মাসিক বন্ধের দ্বিতীয় মাস থেকেই স্তনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইস্ট্রোজেন নামক এক ধরনের হরমোনের প্রভাবে স্তন দুটি বড় হতে থাকে। স্তনের অগ্রভাগ অতিরিক্ত স্পর্শকাতর হয়। গর্ভবতী মা স্তনে অল্প ব্যাথা অনুভব করেন। স্তনের বোটা বা নিপল ক্রমশ বড় ও দৃঢ় হয়। বোটার চার পাশে বাদামী রঙের ত্বক বা এরিওলা (Areola) ক্রমশ কালো হতে থাকে। গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি সময় হতে বোটা থেকে পাতলা দুধের মতো এক ধরনের তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় একে বলা হয় কোলোস্ট্রাম।

৫. জরায়ু পরিবর্তনঃ গর্ভাবস্থায় জরায়ুর আকার ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। জরায়ু সন্তানধারণের জন্য আকারে বেড়ে যায়। সাধারণ অবস্থায় জরায়ু তলপেটে থাকে এবং লম্বা ৭.৫ সেন্টিমিটার হয়। গর্ভাবস্থায় ১২ সপ্তাহের পর পেটের ওপর চাপ দিয়ে তা অনুভব করা যায়। জরায়ু ক্রমশ বাড়তে থাকে। গর্ভসঞ্চারনের ২৪ সপ্তাহ পর জরায়ু নাভির ঠিক ওপরে থাকে এবং ৩৬ সপ্তাহে পাজরের নিচে চলে আসে। প্রসবের দিন যখন এগিয়ে আসে, তখন গর্ভস্থ সন্তানের মাথা শ্রেণী- গহবরে (Pelvic Cavity) প্রবেশ করে।

৬. ত্বকের পরিবর্তনঃ হরমোনের প্রভাবে দেহের নানা স্থানে বিশেষ করে ত্বকে টান ধরে। তার ফলে পেটের ত্বকে সাদা দাগ হয়। সন্তান প্রসবের পর মুখের এবং পেটের দাগ ক্রমশ মিলিয়ে যায়।

৭. ওজন বৃদ্ধিঃ গর্ভবস্থায় মায়ের ওজন ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ওজন বৃদ্ধির পরিমাণ গড়ে ১০ থেকে ১২ কিলোগ্রাম।

৮. সন্তানের নড়ার অনুভূতিঃ সাধারণত ৫ মাস হতে মা তার তলপেটে সন্তানের নড়াচড়া টের পান। প্রথমবারের গর্ভবতী মায়ের পক্ষে এ নড়াচড়া টের পেতে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে। যতই সময় যেতে থাকবে এ নড়াচড়া ততই বেশি করে হতে থাকবে। কিন্তু শেষের সপ্তাহগুলোতে নড়াচড়া আবার কমতে শুরু করে। এ নড়াচড়া যেমন কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই তেমনি ব্যতিক্রম দেখলেও ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে ২৪ ঘন্টায় যদি একবারও নড়াচড়া টের না পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই সময় নষ্ট না করে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে হবে।

মাসিক বন্ধঃ করণীয় পরীক্ষা

প্রস্রাব পরীক্ষা ঃ মাসিক বন্ধ গর্ভসঞ্চারের একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এটি নিশ্চিত লক্ষণ নয়। কারণ গর্ভধারন ছাড়াও আরো নানা কারণে মাসিক বন্ধ বা মাসিক গোলমাল হতে পারে। তাই কোনো মহিলার মাসিক বন্ধ হলে তার গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা জানার জন্য প্রস্রাব পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। গর্ভসঞ্চার হলে গর্ভবতী মহিলার প্রস্রাবে গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর থেকে হিউম্যান কোরিয়ানিক গোনাডোট্রোফিন (সংক্ষেপে এইচসিজি) পাওয়া যায়।

আল্ট্রাসনোগ্রাফি ঃ ভ্রুণ যখন বড় হচ্ছে, তখন মাকে নানাভাবে সাবধান থাকতে হয়। অথচ সন্তানের অবস্থান এবং অবস্থা এ সবই জানার প্রয়োজন। আল্ট্রাসনোগ্রাফি এ রকমই একটি পরীক্ষা পদ্ধতি। এ পরীক্ষায়

শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে গর্ভের অবস্থা জানা সম্ভব। একটা স্ক্যানার দিয়ে মায়ের পেটের ওপর এ শব্দ তরঙ্গের ব্যবহারে আলাদা একটা টেলিভিশনের মতন পর্দায় গর্ভের অভ্যন্তরীণ ছবি দেখা যায়। তাতেই বোঝা যায় গর্ভস্থ সন্তান ঠিকমতো বাড়ছে কিনা, কি অবস্থায় সে গর্ভে আছে, যমজ সন্তানের উপস্থিতি। এ পরীক্ষায় মায়ের কোনো রকম কষ্ট তো হয়ই না, বরং গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং সুস্থ সন্তানের জন্ম সম্ভব হয়।

প্রসবের দিন নির্ণয়

প্রথম পদ্ধতি ঃ মাসিক ঋতুচক্রের শেষ স্রাবের প্রথম দিনের সঙ্গে নয় মাস সাত দিন যোগ করেই প্রসবের দিন নির্ণয় করা হয়। যদি কোনো গর্ভবতী মায়ের শেষ মাসিকের শুরুর তারিখ হয় ২০ শে ডিসেম্বর, তাহলে তার প্রসবের তারিখ হবে পরবর্তী বছরের ২৭ শে সেপ্টেম্বর। প্রসবের তারিখে অনেকেরই প্রসব না হতে পারে। কারো আগে, কারো পরে হয়। সেজন্য প্রসবের তারিখকে বলা হয় সম্ভাব্য ডেলিভারি ডেট। পুরো গর্ভবস্থা হলো ৪০ সপ্তাহ বা ২৮০ দিন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ যে তারিখে শেষ মাসিক হয়েছিল সেই তারিখ থেকে ৩ মাস বাদ দিয়ে এর সাথে ৭ দিন যোগ দিন। যেমন- কোনো গর্ভবতী মায়ের শেষ মাসিক ১০ই মে শুরু হয়েছিল। ১০ মে থেকে ৩ মাস বাদ দিয়ে হয় ১০ই ফেব্রুয়ারি, এবং এর সাথে ৭ দিন যোগ দিলে হয় ১৭ই ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ কোনো গর্ভবতী মায়ের মাসিক ১০ই মে শুরু হলে তার প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ হবে পরবর্তী বছরের ১৭ই ফেব্রুয়ারি।

গর্ভবতী মায়ের নয় (০৯) মাসের শারীরিক পঞ্জিকা

প্রথম তিন মাস

ক. প্রথম মাস

- ❒ প্রথম মাসে মাসিক বন্ধ।
- ❒ স্তন ভারী হয়ে উঠবে, একটা অস্বস্তি এবং ব্যাথা ভাবও থাকবে।
- ❒ ঘন ঘন বাথরুমে যাবার (প্রস্রাব করা) ইচ্ছা।
- ❒ মুখে একটা বিস্বাদ ভাব।
- ❒ ক্লান্তি এবং (অথবা) নিদ্রাহীনতা।

খ. দ্বিতীয় মাস

- ❒ দ্বিতীয় মাসেও মাসিক বন্ধ থাকবে।
- ❒ স্তনস্ফীত হয়ে উঠবে এবং শিরাও দেখা যাবে।
- ❒ বার বার বাথরুমে যাবে।
- ❒ গা- গুলানো ভাব এবং বমি হওয়া, এটা দিনের যে কোনো সময় হতে পারে।
- ❒ কোনো কোনো খাবারে অনিচ্ছা। এমনকি, চা, কফিও খেতে ইচ্ছে করবে না।

গ. তৃতীয় মাস

- ❒ স্তনবৃন্ত ও তার চার পাশ গাঢ় খয়েরি হয়ে উঠে। ছোট ছোট দানা দানা দেখা যায়।
- ❒ বমি ভাবটা থেকেই যায়।
- ❒ ওজন বাড়তে থাকে।
- ❒ কোমর ভারী হয়ে আসে।
- ❒ খুব বেশি ক্লান্তি অনুভব করা।

দ্বিতীয় তিন মাস

ক. চতুর্থ মাস

- ❒ গা- গুলানো ভাবটা সাধারণত বন্ধ হয়ে যায়।
- ❒ তল পেট বড় হয়ে যাবার জন্য অন্তঃসত্ত্বা সহজেই বোঝা যায়।
- ❒ স্তনের স্ফিত ভাবটাও থাকবে।
- ❒ জরায়ু সংকোচন বোধ করা।

খ. পঞ্চম মাস

- ❒ পেটের ত্বক হলুদ রঙের বা স্বচ্ছ রস নিঃসৃত হওয়া।
- ❒ শরীরের বিভিন্ন অংশে দাগ দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে পেটের মাঝখানে।
- ❒ মুখের ত্বকেও ছোপ ছোপ ভাব দেখা যেতে পারে।
- ❒ মাথার চুল পড়ে যেতে পারে।

গ. ষষ্ঠ মাস

- ❒ পেটের ত্বক পাতলা হয়ে যায় এবং দাগ দেখা দেয়।
- ❒ ক্রমশ ওজন বাড়তে থাকে।
- ❒ কোনো বিশেষ খাবারের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।

শেষ তিন মাস

ক. সপ্তম মাস

- ❒ গর্ভস্থ সন্তান খুব নড়াচড়া করবে সেটা মা যেমন বোধ করবেন, তেমনি বাইরে থেকেও দেখা যাবে।
- ❒ অনেক সময় বদহজম হতে পারে। কোমরে এবং পিঠে ব্যথা হয়।

খ. অষ্টম মাস

- ❒ নাভি অনেক সময় বেরিয়ে আসে।
- ❒ গোড়ালির কাছটা দিনের বেলায় ফুলে উঠতে পারে। রাতে শোয়ার পর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। গর্ভস্থ সন্তানের জন্য পাজরে চাপ পড়বে এবং ব্যথাও হতে পারে। যথেষ্ট পরিমাণে শাকসব্জি না খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগবে।
- ❒ দিনের শেষে ক্লান্তি অত্যন্ত বেশি হয়।

গ. নবম মাস

- ❒ স্তনের স্ফীতি আরও বেড়ে যাবে এবং রস নিঃসৃত হতে পারে।
- ❒ জরায়ুর সংকোচন ঘন ঘন হতে থাকবে।

গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা

গর্ভাবস্থায় প্রতিটি মহিলার উচিৎ তার শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া। গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা গর্ভস্থ সন্তান ও মা উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন এ পরিচর্যা সাহায্য করে মায়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে, তেমনি সুস্থ সবল শিশুর জন্মদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গর্ভধারণের পর প্রথম সাত মাস প্রতিমাসে একবার, পরবর্তী দু'মাস প্রতি দুই সপ্তাহে একবার এবং তারপর প্রসবের আগ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে একবার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া উচিৎ।

গর্ভবতী মায়ের চেকআপে যা করণীয়

১. প্রথমবার পরীক্ষার সময় চিকিৎসা কেন্দ্রে যা পরীক্ষা করে তা হল-

গর্ভবতী মাকে পরীক্ষাঃ উচ্চতা, ওজন, রক্তচাপ, সাধারণ স্বাস্থ্য, রক্তস্বল্পতা, পা ফোলা, হার্টের অসুখ, মেদবাহুল্য ইত্যাদি।

পরীক্ষাগারে পরীক্ষাঃ রক্তের হিমোগ্লোবিন্, রক্তের গ্রুপ, আর আইচ ফ্যাক্টর, প্রস্রাব পরীক্ষা, বিশেষ করে অ্যালবুমিন এবং সুগার, সিফিলিসের পরীক্ষা, হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের পরীক্ষা, সম্ভব হলে এইডস ভাইরাসের পরীক্ষা।

২. পরবর্তীতে প্রতিবার গর্ভবতী মা যখন চিকিৎসা কেন্দ্রে যাবে তখন তার নিম্নলিখিত পরীক্ষাসমূহ করা হবে।

প্রতি চেকআপে একই মেশিনে একই সময়ে ওজন নেয়া ও তা রেকর্ড করা। রক্তচাপ মাপা, রক্তস্বল্পতা, পা ও শরীর ফোলা, হার্ট ও ফুসফুসের অবস্থা দেখা, রক্তের হিমোগ্লোবিন, প্রস্রাবের পরীক্ষা বিশেষ করে অ্যালবুমিন ও সুগার।

৩. জরায়ুর উচ্চতা দেখা- এটি গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধির পরিমাপ। জরায়ুতে সন্তানের অবস্থান এবং ছয় মাসের পর থেকে ফিটাস (গর্ভস্থ সন্তান) এর হার্টবিট শোনা।

৪. শেষ চেকআপে পেলভিসের (প্যাসেজের) পরিমাণ নেয়া।

৫. গর্ভবতীর কোনো জটিলতা থাকলে তার সঠিক নির্ণয় ও প্রতিকার করা।

৬. বিশুদ্ধ পানি পান, সুষম খাবার ও সহবাস পদ্ধতি সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীকে শেখানো।

৭. আট থেকে আঠারো সপ্তাহের মধ্যে জরায়ুর আল্ট্রাসনোগ্রাফি করে ভ্রুণ সঠিক অবস্থানে আছে কিনা তা জানা যায়। ৩২-৩৩ সপ্তাহের মধ্যে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে জরায়ুতে গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থান সঠিক কিনা জানা যায়।

প্রসবকালীন উপদেশ

১. নিয়মিত চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করানো কতটা প্রয়োজনীয় তা গর্ভবতী মাকে বোঝানো।

২. সুষম খাবার, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে গর্ভবতীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি।

৩. ধুনষ্টংকার প্রতিষেধক দেয়া।

৪. সর্বোপরি প্রসব ও শিশুর প্রতিপালন সম্পর্কে মায়েদের মনে একটা মানসিক প্রস্তুতির চেষ্টা করা। কোনো রকম ভয় বা ভুল ধারণা যতটা সম্ভব দুর করা।

গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি

১. পরিশ্রম ও বিশ্রামঃ গর্ভবস্থায় একজন মহিলা কতটা পরিশ্রম করবে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। সাধারণত বলা যায়, মা গর্ভবস্থায় তার স্বাভাবিক সংসারের সব কাজই করবেন তবে প্রথম তিনমাস এবং শেষের দু এক মাস খুব ভারী বা পরিশ্রমের কাজ না করাই ভালো। যেমন- কাপড় কাচা, ভারী জিনিস তোলা ইত্যাদি না করা। গর্ভাবস্থায় সিঁড়িতে উঠা নামার সময় যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিৎ। গর্ভবতী মায়ের যেন ভালো ঘুম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গর্ভবতীকে দৈনিক নয় থেকে দশ ঘন্টা ঘুমাতে হবে। দিনে দুই ঘন্টা এবং রাতে আট ঘন্টা ঘুমাতে হবে। যদি কারো ঘুমের অসুবিধা থাকে, তা হলে তাকে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে, গর্ভাবস্থায় রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বিশ্রাম নিতে হবে। প্রয়োজন হলে সামান্য কয়েকদিন রাতে ঘুমের ওষুধ খেতে হতে পারে।

২. গোসলঃ প্রতিদিন ভালভাবে গোসল করা উচিৎ। তবে পুকুরে সাঁতার কাটা বা পানিতে ঝাপ দেয়া ঠিক নয়।

৩. পোশাকঃ গর্ভাবস্থায় যাতে পেটের ওপর চাপ কম পড়ে এবং চলাফেরায় আরাম পাওয়া যায় সেজন্য ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হবে। অবশ্য প্রথম দিকে ৪/৫ মাস পোশাক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। অন্তর্বাসও প্রয়োজন অনুপাতে ঢিলে হবে। এ সময় সিনথেটিক ব্যবহার না করে সুতির পোশাক পরাই ভাল।

৪. জুতাঃ গর্ভাবস্থায় উঁচু হিলের জুতা ব্যবহার করা উচিৎ নয়। জুতা নরম এবং সঠিক মাপ মতো হওয়া আবশ্যক। জুতা পরে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে চলাফেরা করতে যাতে কোনো রকম ব্যঘাত না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সময় শরীরের ওজন ক্রমশ বাড়তে থাকে। ভারি দেহের ভারসাম্য রক্ষার জন্য নিচু অথবা মাঝারি ধরনের হিলওয়ালা জুতা পড়া বাঞ্চনীয়।

৫. দাঁতের যত্নঃ গর্ভাবস্থায় দাঁতের যত্ন নেয়া খুবই প্রয়োজন। এ সময় দাঁত পরিষ্কার রাখতে হবে। গর্ভাবস্থায় অনেক সময় দাঁতের মাড়ি ফুলে রক্তপাত হয়। তাই শোয়ার আগে দাঁত ব্রাশ করা প্রয়োজন। দাঁত খারাপ থাকলে ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার যেমন দুধ, ঘি, মাখন, ছোট মাছ (কাটা মাছ) ইত্যাদি বেশি পরিমানে খেতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৬. স্তনের যত্নঃ গর্ভাবস্থায় গর্ভের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত স্তনের বিশেষ যত্ন নেয়া উচিৎ। তা ছাড়া স্তনের বোটা বা নিপল যাতে ফেটে না যায় এবং গঠন সুঠাম হয় সেজন্যে গ্লিসারিন মাখা যেতে পারে অথবা বোটার সামনের দিকে একটু টেনে আঙুলে তেল (অলিভ অয়েল হলে ভাল হয়) নিয়ে বুড়ো আঙুলের সাহায্যে আস্তে আস্তে ম্যাসেজ করা যেতে পারে। এতে পরে নবজাতকের স্তন্যপানের সুবিধা হবে।

৭. ত্বকের যত্নঃ গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন গোসলের পরে তলপেটে আস্তে আস্তে তেল মালিশ করা ভাল। তাহলে পেটের ত্বক সহজে প্রসারিত হবে এবং ত্বকে টান কম পড়ার কারণে সাদা সাদা দাগ কম হবে।

৮. কোষ্ঠকাঠিন্যঃ গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ সমস্যা। কোষ্ঠকাঠিন্য যেন না হয় এর জন্য প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জি, পানি, ফল বা ফলের রস খেতে হবে। তাছাড়া ইসবগুলের শরবত খেলেও উপকার পাওয়া যাবে। যদি এসবেও কোষ্ঠকাঠিন্য ভাল না হয় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৯. চাকরিজীবীঃ গর্ভবতী মা যদি চাকরিজীবী হন, তাহলে কি ধরনের কাজ এবং কতদিন ঐ কাজ করতে পারবে তা নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। গর্ভকালীন শরীরের অবস্থার ওপর কাজ করা বা না করা নির্ভর করবে। গর্ভবস্থায় চাকরি করলে এ সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠা নামা খুব সাবধানে করতে হবে।

১০. ব্যায়ামঃ শরীর সুস্থ রাখা এবং সহজ প্রসবের জন্য গর্ভাবস্থায় ব্যায়াম করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যহ সকালে বা সন্ধ্যায় এক ঘন্টা করে হাঁটলে ঠিকমতো রক্ত চলাচলে সহায়তা করে এবং পেশিগুলোও সুস্থ সবল অবস্থায় থাকে। সাধারণ স্বাস্থ্যের অধিকারী মহিলাদের ঘরের দৈনন্দিন কাজের ওপর অতিরিক্ত কিছুটা শারীরিক অনুশীলন করলে শরীর ও মনের উপকারই হয়।

১১. প্রতিষেধকঃ ধুনষ্টংকার রোগের প্রতিষেধক ইঞ্জেকশনের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ মা ও সন্তান উভয়কেই শঙ্কা মুক্ত রাখবে।

১২. সহবাসঃ সহবাস সব সময়ই দম্পতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায় গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস সহবাস থেকে বিরত থাকা দ্বিতীয় তিন মাসে দম্পতির ইচ্ছেমতো করা যায়। তবে তাও নির্ভর করে গর্ভবতীর শরীরের অবস্থার ওপর। প্রয়োজনে নিয়মিত চেকআপকারী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া ভাল। শেষ তিন মাস গর্ভবতীর শারীরিক অবস্থার জন্য সহবাসে অসুবিধা হতে পারে। তাছাড়া সহবাসের ফলে জীবাণুর সংক্রমন হতে পারে। তাই শেষ তিন মাসও সহবাস না করাই ভাল।

১৩. ভ্রমণঃ বর্তমানে অনেক মহিলাই কর্মজীবী। কর্মজীবী মাহিলাদের কাজের জন্য বাইরে যেতেই হয়। তবে গর্ভবতী মাকে সাবধানে যাতায়াত করতে হবে। বেশি ঝাকুনি লাগে (যেমন- খারাপ রাস্তায় রিকশা, স্কুটার বা বাসে চলা) ও বেশি পরিশ্রম বোধ হয়, তা না করাই ভালো।

১৪. গর্ভাবস্থায় ওষুধঃ গর্ভাবস্থায় যতটা সম্ভব সব রকমের ওষুধ বর্জন করা উচিৎ। বিশেষ করে ঘুমের ওষুধ, ব্যথা নিরোধক ওষুধ, মৃগীরোগের ওষুধ, হরমোন, থাইরয়েডের ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি। এসব ওষুধের কিছু না কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকে। বিশেষ করে এসব ওষুধ সেবনের ফলে ভ্রুণের গঠনে গুরুতর ত্রুটি দেখা দিতে পারে। তবে কোনো ওষুধ ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন হলে তা নির্বাচনে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। গর্ভের প্রথম তিন মাসেই ভ্রুণের সব অঙ্গের গঠন হয়, তাই এ সময় ওষুধ ব্যবহারে সাবধান হতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজ থেকে কোনো ওষুধই ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

১৫. ধুমপানঃ গর্ভাবস্থায় ধুমপান করা মোটেও উচিৎ নয়। জন্ম সময়ে শিশুর ওজন কম হয় ধুমপায়ী মায়েদের ক্ষেত্রে। এ ঘটনা সরাসরি ধূমপানের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া অধূমপায়ী গর্ভবতী মায়েদের পাশে বসে যদি তার স্বামী অথবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ধূমপান করেন তা হলেও গর্ভস্থ সন্তানের ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

১৬. যোনি পথের রোগঃ গর্ভাবস্থায় যোনির নিঃসরণ বেড়ে যায়। কিন্তু অতিরিক্ত যোনি নিঃসরণ, দর্গন্ধযুক্ত বা সাথে চুলকানি থাকলে অথবা অন্য কোনো রোগ থাকলে তা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রসবের আগেই সম্পূর্ণ সারিয়ে ফেলতে হবে। তা না হলে প্রসবের সময় যোনি পথের রোগ শিশুর চোখে, নাভিতে বা শরীরের যে কোন জায়গায় আক্রমণ করতে পারে। যেমন- গনোরিয়া রোগ যোনিপথ থেকে শিশুর চোখে সহজেই সংক্রমিত হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যে শিশুর চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

১৭. গর্ভাবস্থায় বিপদ সংকেতঃ গর্ভাবস্থায় সম্পূর্ণ সময়টাই ভাবী মায়ের শরীরের যত্ন নেয়া চিকিৎসক ও অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য। এ সময় নিম্নলিখিত উপসর্গ বা লক্ষণগুলো দেখা দিলে সাবধান হতে হবে-

- ❒ রক্তস্বল্পতা
- ❒ পা ফোলা
- ❒ উচ্চ রক্তচাপ
- ❒ যোনিপথে রক্তক্ষরণ/রক্তস্রাব/দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব
- ❒ প্রস্রাব পরীক্ষায় সুগার পাওয়া
- ❒ জন্ডিস
- ❒ খিঁচুনি
- ❒ প্রস্রাব খুব কম হওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া
- ❒ অতিরিক্ত বমি হওয়া
- ❒ পেটে ব্যথা
- ❒ শ্বাসকষ্ট
- ❒ মাস অনুযায়ী তলপেটের বৃদ্ধি না হওয়া
- ❒ প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া ভাব
- ❒ গর্ভাবস্থায় জ্বালা পোড়া ভাব
- ❒ গর্ভাবস্থায় জ্বর

ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভঃ

যে সব মহিলার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যা প্রায়ই দেখা দেয়-

- ❒ ১৮ বছর বয়সের পূর্বে গর্ভধারণ
- ❒ ৩০ বছর বয়সের পর প্রথম গর্ভধারণ
- ❒ চতুর্থ সন্তান জন্মের পর গর্ভধারণ
- ❒ পূর্ববর্তী গর্ভের জটিলতা এবং অস্ত্রোপচারের পর গর্ভধারণ
- ❒ তুলনামূলকভাবে খুব কম উচ্চতার মহিলা (৪ ফুট ১০ ইঞ্চির কম)
- ❒ গর্ভাবস্থায় রক্তস্বল্পতা
- ❒ যমজ সন্তান

গর্ভবতী মায়ের খাবার

সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম হয়ে বেচে থাকার জন্য আমাদের প্রতিদিন সুষম খাবারের প্রয়োজন। একজন গর্ভবতী মহিলার সুষম-পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। কারণ এ খাবার তার নিজের শারীরিক চাহিদা তো মেটাবেই, তাছাড়া তার গর্ভস্থ সন্তানের প্রয়োজনীয় পুষ্টিও এ থেকেই সংগৃহীত হবে। তাই বলে পুরো দু'জনের খাবার খেতে হবে তা কিন্তু নয়। কেননা অতিরিক্ত খাবার শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক ওজন বৃদ্ধি ঘটিয়ে গর্ভাবস্থায় ও পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। গর্ভস্থ ভ্রুণের গঠন ও সঠিক বৃদ্ধির জন্য গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনানুসারে বাড়তি খাবার খেতে হবে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলাই অপুষ্টিতে ভোগেন এবং অপুষ্টি শরীরেই সন্তান ধারণ করেন, গর্ভাবস্থায় সঠিক মাপে পুষ্টিকর খাবারও গ্রহণ করেন না। ফলে জন্মগতভাবেই শিশু অপুষ্টি নিয়ে জন্মায়। এ ধরনের শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি যেমন বেশি, তেমনি পরবর্তীতে যথেষ্ট খাবার খেয়েও এদের শারীরিক পূর্ণতা আসে না। তুলনামূলকভাবে অপূরণীয় ক্ষতি হয় মস্তিষ্কের কোষ বৃদ্ধিতে। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়েই শিশু মস্তিষ্কের শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সে সময় মায়ের পুষ্টির অভাব হলে, বিশেষ করে আয়োডিনের অভাব হলে মস্তিষ্কের কোষ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়। এমনিভাবে বিভিন্ন রকম খাদ্য উপাদানের অভাবহেতু বিভিন্ন রকম শারীরিক বিকলঙ্গতা ও মানসিক অসুস্থতাও ঘটতে পারে। এতে শুধু শিশুর ওপর প্রভাবই নয়, মায়ের নিজের জীবনও যথেষ্ট ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা অনুযায়ী তাদের দৈনিক চাহিদাও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের শারীরিক গঠন, বয়স ,কাজের নমুনা এবং গর্ভকালীন তার পুষ্টিগত অবস্থা বিবেচনা করা হয়। পুরো গর্ভকালীন ৩ মাস করে ভাগ করলে ১ম, ২য় ও ৩য় ট্রাইমেস্টারে পুষ্টি চাহিদাও ভিন্ন হয়। গর্ভাবস্থায় মা যে খাবার খাবেন, সাধারণভাবে তা স্বাভাবিক অবস্থার চাহিদার এক-পঞ্চমাংশ (১/৫) বেশি। এক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির মান সঠিক হচ্ছে কিনা তা নির্ণয়ের একটা সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত উপায় হচ্ছে- মাসে মাসে মায়ের ওজন নেয়া। গর্ভবতী মা যদি প্রয়োজনীয় সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খায় তাহলে গর্ভাবস্থায় শেষ পর্যায়ে তার ওজন গর্ভপূর্বকালীন ওজনের চেয়ে গড়ে ২৬ পাউন্ড বা ১২ কেজি বৃদ্ধি পায়। এ ওজন বৃদ্ধির ধারা মোটামুটি এরকম- প্রথম তিনমাসে এক কেজি, দ্বিতীয় তিনমাসে পাঁচ/ছয় কেজি এবং তৃতীয় তিন মাসে পাঁচ কেজি। প্রতি মাসে ওজন গড়ে কমপক্ষে এক দশমিক পাঁচ (১.৫) কেজি বৃদ্ধিই মায়ের পুষ্টির নির্ণায়ক।

আমাদের দেশে একজন সুস্থ মহিলার স্বাভাবিক ক্যালরি চাহিদা ২০০০-২২০০ কিলো ক্যালরি। গর্ভাবস্থায় এর সঙ্গে দৈনিক অতিরিক্ত ৩০০-৫০০ ক্যালরি অর্থাৎ মোট ২৫০০ কিলো ক্যালরি প্রয়োজন।

মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে গর্ভের প্রথম তিন মাস স্বাভাবিক খাবার খেলেই চলে, শুধু আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডাল প্রভৃতি মায়ের নিজের দেহের পুষ্টি ও গর্ভস্থ ভ্রূণের শারীরিক গঠন ও বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রাণীজ প্রোটিনের প্রয়োজন বেশি। দৈনিক অন্তত ৬০ গ্রাম প্রাণীজ প্রোটিন (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ) ইত্যাদি গ্রহণ করা উচিৎ। আমাদের দেশে আর্থিক অবস্থার কারণে অনেক মায়ের পক্ষেই পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাণীজ আমিষ গ্রহণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে খাদ্য তালিকায় ডাল, সিমের বীচি, ছোলা ইত্যাদি উদ্ভিজ আমিষের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। তবে এর সঙ্গে মাছ রাখতে পারলে প্রয়োজনীয় আমিষের অভাব হবে না।

তাপ ও শক্তিদায়ক খাদ্য অর্থাৎ শর্করা জাতীয় খাবার যেমন- ভাত, রুটি, মুড়ি ইত্যাদি খাবার স্বাভাবিক অবস্থায় যতটুকু দরকার তার চেয়ে ৫০ গ্রাম বা ১ ছটাক পরিমাণ বাড়াতে হবে। দৈনিক ১০০ গ্রাম স্নেহ জাতীয় খাদ্য আবশ্যক।

ফলমূল, শাকসব্জি প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধক খাবার এবং এগুলোতে রয়েছে প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন। তাই গর্ভবতী মা'কে প্রতিদিন প্রচুর শাকসব্জি ও তাজা ফলমূল খেতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশে রান্না করার প্রণালীর কারণে শাকসব্জি থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়, তাই গর্ভবতী মায়ের উচিৎ যতদূর সম্ভব সবুজ-শাকসব্জি আধাসিদ্ধ ও সালাদ করে খাওয়া। ফলের ক্ষেত্রে মৌসুমী ফলই যথেষ্ট। দামী বিদেশী ফল যেমন- আঙ্গুর, বেদানা ইত্যাদি খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

গর্ভবতী মা ও গর্ভস্থ সন্তানকে রক্তস্বল্পতার হাত থেকে রক্ষার জন্য খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ফলিক এসিড ও লৌহের উপস্থিতি প্রয়োজন। এ দু'টি পুষ্টি উপাদানেও সমৃদ্ধ উৎস সবুজ শাকসব্জি। বিশেষ করে কচু শাক, পুঁই শাক, ডাটা ও অন্যান্য শাক, কাঁচা কলা ইত্যাদি লৌহের উৎকৃষ্ট উৎস। তা ছাড়া মাংস, যকৃত (কলিজা) ইত্যাদিতে প্রচুর লৌহ রয়েছে। তাই গর্ভাবস্থায় এসব খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

অনেক গর্ভবতী মহিলার দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপাত হয়। এটা হয় ভিটামিন 'সি' এর অভাবে। তা ছাড়া রক্তস্বল্পতার জন্য যেসব গর্ভবতী মা'কে অনুপূরক ফেরাস লবণ (লৌহ/আয়রণ ট্যাবলেট) দেয়া হয়, তাদের পাকস্থলী থেকে এ লবণের যথাযথ পরিশোষণের জন্যে খাবারে যথেষ্ট ভিটামিন 'সি' থাকা দরকার। এর জন্য ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল যেমন- পেয়ারা, আমড়া, কামরাঙ্গা, আমলকি, লেবু, জামবুরা ইত্যাদি খাবার তালিকায় থাকা প্রয়োজন।

গর্ভবতী মা'র খাদ্য তালিকায় আরেকটি অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম। গর্ভস্থ ভ্রূণের অস্থি গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। তাছাড়াও গর্ভস্থ মহিলাদের অনেক সময়ই পায়ের মাংসপেশিতে যে ব্যথা হয় তার জন্য অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম খাওয়া প্রয়োজন। এক লিটার দুধে প্রায় ১০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। সুতরাং গর্ভাবস্থায় ৫০০ মিলি: থেকে ১লিটার দুধ খাওয়া দরকার। মাখন, ডিম, বড় মাছ ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, তাই ক্যালসিয়ামের অভাব দূর করার জন্য গর্ভবতী মাকে এ জাতীয় খাবার খেতে হবে।

প্রসূতি মায়ের খাবার

প্রসূতি মায়ের খাবার বলতে বুঝায় মা ও তার নবজাতক শিশুর খাবার। সন্তান প্রসবের সময় এবং তারপর প্রায় ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে মায়ের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে প্রধান হলো রক্তক্ষয়। এ সময় সব মিলিয়ে তার শরীর থেকে প্রায় এক লিটার রক্ত বেরিয়ে যায়। আবার বুকের দুধ তৈরির জন্য মায়ের শরীর ক্ষয় হয়। এসব ক্ষয়পূরণের জন্য মা যদি বাড়তি খাবার না খান, তবে তার দেহের ক্ষয় পূরণ হবে না অর্থাৎ তার জীবনীশক্তি কমে যাবে। তিনি দুর্বল হয়ে পড়বেন ও নানা অসুখে ভুগবেন। সন্তানের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কম দুধ তৈরি হবে এবং দুধে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিমাণও কম থাকবে। এমতাবস্থায় শিশু উপযুক্ত পুষ্টি না পেয়ে জীবনের শুরু থেকেই অপুষ্টিতে ভুগতে শুরু করবে।

মা যদি স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি পরিমাণে সব কয়টি খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করেন তবে তার (মা) নিজের স্বাস্থ্য অটুট রেখে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় দুধ তৈরি করতে সক্ষম হবে। আর যদি মা কম খাবার গ্রহণ করেন তাহলে তার নিজের শরীরও দুর্বল হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে তার সন্তানের জন্যও প্রয়োজনের তুলনায় কম দুধ তৈরি হবে।

গর্ভবতী মহিলার প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা।

নাম	উৎস	কার্য
প্রোটিন	মাংস, মাছ, ডিম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, শুকনো বিন, মটরশুটি, ডাল, বাদাম, শস্য।	গর্ভস্থ সন্তানের টিস্যু তৈরি, ফুলের (প্লাসেন্টা) বৃদ্ধি এবং জরায়ুর শক্তি বৃদ্ধির জন্য।
কার্বোহাইড্রেট	ময়দা, ডাল, ভাত, খই, ইত্যাদি ফল, মধু ও দুধ।	এগুলো বেশি খেলে মোটা হয়ে যাবেন। কিন্তু সন্তান হওয়ার সময় এগুলোর প্রয়োজন আছে।
চর্বি	মাংস, ডিম, তৈলাক্ত মাছ, গাজর, টমেটো, রঙিন পাকা ফল, রঙিন শাকসব্জি।	ত্বকের জন্য আদর্শ, এ ছাড়া চোখ, হাড় ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের জন্য।
ভিটামিন-বি গ্রুপ	সবুজ পাতাওয়ালা শাকসব্জি, ফল, যকৃৎ, কিডনি ও খোসাসহ গম।	কোষ্ঠকঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে, এনার্জি বাড়ায় ও রক্তে লোহিত কণিকা বাড়াতে সাহায্য করে।
ভিটামিন-সি	টক ফল, সবুজ শাকসব্জি, ফল, মরিচ, টমেটো এবং আলু (মনে রাখবেন বেশিক্ষণ রান্না করলে ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়)	ফুল বা প্লাসেন্টাকে শক্ত করতে সাহায্য করে, লোহা রক্তে মিশে যেতে সাহায্য করে, শিশুর ত্বক, লিগামেন্ট ও হাড় তৈরি করতে সাহায্য করে।
ভিটামিন-ডি	তৈলাক্ত মাছ, ডিম, মাখন , ছানা ও যকৃৎ।	ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে সাহায্য করে।
ভিটামিন-ই	আপেল, গাজর, বাঁধাকপি, ডিম, অলিভ তেল ও সূর্যমুখি বীজ।	রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে।
ভিটামিন-কে	সবুজ পাতাসহ শাকসব্জি, ডিম ভাত, ডাল, খই, মুড়ি ও আলু।	রক্ত জমাট বাঁধার উপাদান তৈরি করতে সাহায্য করে।
ক্যালসিয়াম	দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ, বাদাম, কমলালেবু, শুকনো ফল, সবুজ পাতাসহ শাকসব্জি, ফুলকপি ও তৈলবীজ।	শিশুর হাড় ও দাঁত তৈরি করতে সাহায্য করে।
লৌহ	মাংস, ভাত, মুড়ি, খই, ডিম, মাছ, পালং শাক, চকলেট, বাদাম।	রক্তস্বল্পতা রোধ করতে সাহায্য করে। শিশুর যকৃতে লৌহ মজুত করে যা জন্মানোর পরে প্রয়োজন হয়।

এসব কারণে প্রসূতি মাকে তার চাহিদা পূরণের জন্য স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অতিরিক্ত খাবার খেতে হয়। প্রতি ১০০ মিলিলিটার দুধ তৈরি হতে ৯০ কিলো ক্যালরি খরচ হয়। গড়ে প্রতিদিন একজন প্রসূতি মা তার শিশুর জন্য ৮৫০-১২০০ মিলিলিটার দুধ তৈরি করে থাকে। এ হিসাবে তার প্রায় বাড়তি ১০০০ কিলো ক্যালরি প্রয়োজন হয়। গর্ভকালীন অবস্থায় শেষ পর্যায়ে মায়ের ওজন যদি স্বাভাবিক অর্থাৎ ১০-১২.৫ কেজি বৃদ্ধি পায় তাহলে এর মধ্যে ২-৪ কেজি অতিরিক্ত চর্বি শরীরে জমা হয়। এই অতিরিক্ত চর্বি ভেঙে যে ক্যালরি আসে তা থেকে প্রতিদিন প্রায় ২৫০ কিলো ক্যালরি দুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এজন্য প্রকৃতপক্ষে প্রসূতি মাকে প্রতিদিন অতিরিক্ত ৭৫০ কিলো ক্যালরির বাড়তি খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত শর্করা ও তেল জাতীয় খাবার খেতে হবে। এর সাথে দৈনিক প্রায় ২৬ গ্রাম অতিরিক্ত আমিষ খেতে হবে। মায়ের খাবারে উন্নতমানের আমিষের ভাগ বেশি থাকলে সাধারণত দুধ বেশি তৈরি হয়। শিশুর শরীর বৃদ্ধি শিশুকালেই সবচেয়ে বেশি হয়, এজন্য প্রয়োজন প্রচুর আমিষ। আর এ আমিষ মায়ের দুধ থেকেই পেয়ে থাকে। তাই আমিষ জাতীয় খাবার প্রসূতি মাকে বেশি পরিমাণে খেতে হবে। তাছাড়া খনিজ লবণ, যেমন- ক্যালসিয়াম, লৌহজাতীয় খাবারও বাড়াতে হবে যাতে দুধের মাধ্যমে এ দুটি উপাদান শিশুর শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

নিরাপদ প্রসব স্থান

হাসপাতাল, নার্সিং হোম বা মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হলো সন্তান প্রসবের নিরাপদ স্থান। তবে সন্তান প্রসব (বিশেষ করে প্রথম সন্তান) হতে হবে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে। যেখানে হাসপাতাল, নার্সিং হোম বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে- সেখানে সন্তান প্রসব কোনো মতেই বাসায় হওয়া উচিৎ নয়। আর যদি এ ধরনের সুযোগ সুবিধা না থাকে, তাহলে নিজ বাড়িতে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন চিকিৎসকের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। চিকিৎসক না পাওয়া গেলে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ একজন ধাত্রীকে রাখা উচিৎ।

তবে যেখানেই প্রসব হোক না কেন গর্ভকালে চিকিৎসক দেখানোর উপকারিতা অনেক, ভয় ও সংকোচ কেটে গিয়ে গর্ভবতীর চিকিৎসকের প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা আসে। প্রসবকালে এ নির্ভরতা ও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চললে কষ্ট অনেক লাঘব হয়।

যাদের বাড়িতে প্রসবের ব্যবস্থা আছে তাদেরও নিয়মিত চিকিৎসাধীন থাকা কর্তব্য। যদি হাসপাতালে প্রসবের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে প্রথম হতেই সেখানকার প্রসবপূর্ব পরিচর্যা বিভাগে নাম লিখে কার্ড সংগ্রহ করা উচিৎ এবং সেখানকার নির্দেশ অনুযায়ী গর্ভের প্রথমদিকে মাসে একবার এবং শেষের দিকে ১-২ সপ্তাহ অন্তর পরীক্ষা করার জন্য যেতে হয়। হাসপাতালে সব সুবিধা থাকায় প্রসবকালে বিশেষ কোনো ওষুধ বা দ্রব্যাদি সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না।

হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে প্রসব কেন হওয়া আবশ্যক

যে সব কারণে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে হওয়া উচিৎ তার মধ্যে রয়েছে-

- ❒ প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করার সময়।
- ❒ যে সব মায়ের চার কিংবা তার বেশি সন্তান রয়েছে।
- ❒ যাদের আগের সন্তান প্রসব হওয়ার পর কোনো অসুবিধা হয়েছে। যেমন- বেশি পরিমাণ রক্তক্ষরণ, ফুল না পড়া ইত্যাদি।
- ❒ যিনি হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, রক্তশূন্যতা, জন্ডিস, পা ফোলা ও এ ধরনের রোগে ভূগছেন তার সন্তান প্রসব অবশ্যই হাসপাতালে হওয়া উচিৎ।
- ❒ একাধিক সন্তান পেটে থাকলে।
- ❒ পেটে শিশুর অবস্থান স্বাভাবিক না হলে।
- ❒ প্রসব ব্যথার গতি অস্বাভাবিক হলে।
- ❒ আগের সন্তান প্রসব হওয়ার সময় কোন অসুবিধা হলে যেমন- শিশু মারা গেলে বা মায়ের কোনো অসুবিধা হলে।
- ❒ গর্ভবতী মায়ের রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে বা হাত পা ফুলে গেলে।
- ❒ প্রসব ব্যথা শুরু হয়েছে অথচ তখনও গর্ভস্থ সন্তানের মাথা নামে নাই।
- ❒ যার জরায়ুতে আগে কোনো অপারেশন হলে।
- ❒ গর্ভবতী মা অজ্ঞান হয়ে পড়লে বা খিঁচুনি হলে।
- ❒ যার আগের সন্তান গর্ভাবস্থার পুরো সময়ের আগেই ভূমিষ্ট হলে।
- ❒ বিয়ের অনেক বছর পর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণের সময়।
- ❒ অধিক বয়সে যিনি প্রথম সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন।

প্রসবের আগে যে সব জিনিসপত্র তৈরি রাখতে হবে

- ❒ টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, চিরুণী, তেল, সাবান, তোয়ালে, শাড়ি সহ মায়ের জন্য নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী।
- ❒ অনেকগুলো খুব পরিষ্কার কাপড় বা কাঁথা।
- ❒ হাত আর নখ পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশ।
- ❒ পরিষ্কার তুলা এক প্যাকেট।
- ❒ গজ এক প্যাকেট।
- ❒ নাড়ি কাটার জন্য একটা নতুন কাচি (নাড়ি কাটার আগে সেটা ফুটিয়ে নিতে হবে)।
- ❒ নাড়ি চাপা দেয়ার জন্য জীবাণুমুক্ত গজ বা পরিষ্কার কাপড়ের কয়েক টুকরা।
- ❒ নাড়ি বাঁধার জন্য দুটো পরিষ্কার ফিতা বা সুতা।
- ❒ শিশুর জন্য একটি র‍্যাপার।
- ❒ শিশুর জামা-কাপড় (ধোয়া, পরিষ্কার ও মোলায়েম)।
- ❒ ছোট তোয়ালে- ২টা।
- ❒ রাবার ক্লথ।
- ❒ বিছানার চাদর।
- ❒ স্যানিটারি প্যাড এক প্যাকেট।

নাভির পরিচর্যা

- ❒ নাভি কাঁটার পর প্রতিদিন স্পিরিট দিয়ে নাভি পরিষ্কার করতে হবে। কোনো রকম পাউডার নাভিতে লাগানোর প্রয়োজন নেই।
- ❒ জন্মের কিছু সময় পর লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নাভি থেকে রক্তপাত হচ্ছে কিনা। কারণ, এ সময়ে নাভি বন্ধনী ঢিলে হলে রক্তক্ষরণ হতে পারে। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিৎ।
- ❒ সাধারণত নাভির উপরের অংশ ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে খসে পড়ে। তবে কোনো কারণে দূষিত বা ঘা হলে বেশি সময় লাগতে পারে। কখনো কখনো দেখা যায় নাভির মুখ স্বাভাবিকভাবে খসে পড়ার পরও ঘা সারতে দেরি হয়। এ অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিৎ।
- ❒ শিশুকে গোসল করানোর সময় নাভিমূল ঢেকে রাখা উচিৎ। তা না হলে গোসলের পানির মাধ্যমে নাভিমূল জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

প্রসব পরবর্তী পরিচর্যা

মায়ের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা, স্তনের যত্ন নেয়া ও শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো, সংক্রমণ প্রতিরোধ, গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ- এ সব ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার জন্য প্রসূতি মায়ের বিশেষ যত্ন নেয়া উচিৎ।

১. সন্তান জন্মানোর পর মা অন্তত ছয় ঘন্টা বিশ্রামে থাকবে। এ সময়ে অত্যধিক রক্তস্রাব বা অন্য কোনো কষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন। মায়ের পছন্দমতো যে কোনো হাল্কা পানীয় অথবা ক্ষিধে থাকলে সামান্য কিছু খাবার দেয়া যেতে পারে। যদি খুব বেশি ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত মনে হয়, তবে কখনো কখনো মায়েদের ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়।

২. ছয় থেকে আট ঘন্টা বিশ্রামের পর বাথরুমে যাওয়া, নবজাতককে বুকে নেয়া ইত্যাদি কাজ শুরু করা দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁটাচলা শুরু করলে কতগুলো সুফল পাওয়া যায়। যেমন-

- জরায়ুতে রক্ত বা অন্যান্য স্রাব জমা না থেকে সহজে বেরোতে পারে। ফলে জরায়ু দ্রুত ছোট হয়ে স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে।
- শিরাতে রক্ত জমাট বেঁধে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা কমে। তবে কোনো অবস্থাতেই অন্তত ছয় সপ্তাহের আগে মায়েদের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করা উচিৎ নয়। এ সময়ে যতটা সম্ভব বিশ্রাম নিতে হবে। দিনের বেলা খাওয়ার পর অবশ্যই দু-ঘন্টা ঘুমানো দরকার। এ ছাড়া কোনো ভারী জিনিস তোলা বা ঠেলা অথবা বেশি পরিশ্রমের কাজ করা অনুচিৎ।

৩. সন্তান জন্মানোর দিন সাধারণত হাল্কা খাবার দিলেও পরদিন থেকেই মায়েদের স্বাভাবিক খাবার দেয়া যায়। বাচ্চা বুকের দুধ খেলে বেশি

পরিমাণে প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং প্রচুর পরিমাণ তরল পানীয় খেতে হয়।

৪. সন্তান জন্ম নেওয়ার পর পেটের এবং মূত্রথলির মাংসপেশি সামান্য শিথিল থাকে। ফলে অনেক সময় মূত্র থলিতে জমা থাকলেও প্রস্রাবের অসুবিধা হতে পারে। সেজন্য সন্তান জন্ম হওয়ার ছয় থেকে আট ঘন্টা পর এবং তারপর প্রতি চার থেকে ছয় ঘন্টায় মায়েদেরও নিজের চেষ্টায় প্রস্রাব করা উচিৎ। অন্যথায় মূত্রনালীতে সহজেই জীবানু সংক্রমণ ঘটে।

৫. সন্তান জন্ম হওয়ার পর কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ সমস্যা। পেট এবং কোমরের মাংসপেশি শিথিলতা, যোনিদ্বার ও তার চারপাশের ব্যথা ইত্যাদি কারণে পায়খানা করতে অসুবিধা হয়ে থাকে। তবে স্বাভাবিক খাবার ও প্রচুর পানি খেলে এবং তাড়াতাড়ি হাঁটাচলা শুরু করলে এ অসুবিধা দূর হয়। নিতান্ত প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

৬. এ সময় শারিরীক ও মানসিক বিশ্রাম অত্যন্ত জরুরী। অত্যাধিক কায়িক শ্রম অথবা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট ঘুম দরকার। তাছাড়া পেট ব্যাথা, যোনিদ্বারে ব্যাথা, বুকে দুধ জমে যাওয়ার জন্য কষ্ট ইত্যাদি থেকেও মুক্ত থাকা দরকার। সে জন্য চিকিৎসকের নির্দেশমত ব্যাথার ও ঘুমের ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

৭. সন্তান জন্ম হওয়ার পরপরই মলদ্বার এবং তার চারপাশ পরিষ্কার সাবান পানি/ডেটল পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় বা স্যানিটারী প্যাড দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। প্রতিবার পায়খানা/প্রস্রাবের পর একইভাবে যত্ন নিতে হবে। যতটা সম্ভব শুকনো রাখা এবং নিয়মিত সময়ে কাপড় বা প্যাড পাল্টানো দরকার। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে যোনিদ্বারে সেলাই দেওয়া থাকে। সেক্ষেত্রে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। দিনে অন্তত দু'বার গরম পানিতে ডেটল দিয়ে ধোয়া এবং জীবাণুনাশক মলম দিতে হবে। অপরিষ্কার পোশাক বা বিছানা থেকে জীবাণু সংক্রমণ ঘটে ক্ষত পেকে যেতে পারে।

৮. যোনিদ্বার সেলাই থাকলে সাধারণত পাঁচ সাত দিনে তা নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়। যতদিন পর্যন্ত ক্ষত না শুকোয় বা জরায়ু থেকে স্রাব বন্ধ না হয় ততদিন কখনো পুকুরে নেমে গোসল করা উচিৎ নয়।

৯. স্তনের যত্ন বিশেষভাবে নেয়া উচিৎ। কারণ শিশুর জন্য মায়ের দুধই সবচেয়ে আদর্শ খাবার। তাছাড়া শিশু দুধ ঠিকমতো না টানতে পারলে দুধ জমে স্তনে ব্যথা বা মারাত্মক ফোড়া হতে পারে। প্রতিবার শিশুকে স্তন দেয়ার আগে পরিষ্কার পানি দিয়ে স্তনের বোটা ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে। শিশুর খাওয়া শেষ হলে শুকনো কাপড়ে মুছে পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে স্তনের বোটা ঢেকে রাখা দরকার।

১০. মা যদি সুস্থ থাকেন, তবে শিশুকে মায়ের কাছেই রাখতে হবে। এতে মা ও শিশু দুজনেরই মানসিক ও শারীরিক ঘনিষ্ঠতা সহজে তৈরী হয়, বিশেষ করে অজানা অচেনা এ দুনিয়ায় সম্পূর্ণ অসহায় জীবটি তার সব থেকে নিরাপদ আশ্রয় সঠিকভাবে চিনে নিতে পারে।

১১. সন্তান জন্ম হওয়ার পর ছয় সপ্তাহ স্বামী সহবাস বন্ধ রাখা ভালো।

১২. যোনিদ্বার বা তার চারপাশের সন্তান জন্মেরও সময় অত্যাধিক চাপ পড়ায় যে আঘাত লাগে, তার জন্য কয়েকদিন ব্যথা থাকতে পারে। যদি ব্যথা খুব বেশি হয় বা ক্রমশ বাড়তে থাকে, তবে অতিসত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

১৩. আমাদের দেশে সব মহিলা কম বেশি রক্তস্বল্পতায় ভোগে। সন্তান জন্মানোর পর তা হঠাৎই বেড়ে যেতে পারে। রক্তস্বল্পতা থাকলে সন্তান জন্ম হওয়ার পর চার-ছয় সপ্তাহ প্রতিদিন একটি করে আয়রণ ট্যাবলেট খাওয়া দরকার।

১৪. রক্তচাপ বেশি থাকলে বা প্রস্রাবে প্রোটিন বেরোতে থাকলে তার যথাযথ চিকিৎসা প্রয়োজন।

এসব সাধারণ নির্দেশ ছাড়াও মায়েদের দু'টি বিশেষ বিষয়ে জানা দরকার। প্রথমত, কিছু ব্যায়াম করা এবং দ্বিতীয়ত, পরবর্তী সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা অন্তত চার-পাঁচ বছর ঠেকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রসব পরবর্তী মায়ের কিছু সমস্যা ও প্রতিকার

প্রসবোত্তর মায়েদের কিছু উপসর্গ দেখা যায় যা সামান্য চেষ্টাতেই প্রতিরোধ করা যায়।

- যোনিপথে অনিয়মিত রক্তস্রাবঃ প্রথমেই মায়েদের বোঝা উচিৎ যে সন্তান হওয়ার পর, বিশেষ করে সন্তান মায়ের দুধ খেলে, প্রথম মাসিক শুরু হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। অনেকের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট দেরীতে শুরু হয়। তাছাড়া প্রথম দু-একমাস মাসিক অনিয়মিত হতে পারে। সাধারণত স্বাস্থ্যেও উন্নতি এবং রক্তস্বল্পতা দূর হলে তা ক্রমশ ঠিক হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাসিকের সময় প্রচুর রক্তপাত হয়। এর কোনোটাই বিশেষ দুশ্চিন্তার নয়। তবে সন্তান জন্মানোর পর থেকে যদি ক্রমাগত রক্তস্রাব হয়, তবে তা জরায়ুতে গর্ভ ফুলের অংশবিশেষ থেকে যাওয়ার জন্য হয়। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিৎ।

- সাদা স্রাবঃ সন্তান হওয়ার পর কিছুদিন এ ধরণের স্রাব স্বাভাবিক। তবে সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি, রক্ত স্বল্পতা, যোনিপথে জীবাণু সংক্রমন অথবা জরায়ুর সম্পুর্ণ সংকোচন না হলে এ স্রাব দীর্ঘদিন ধরে খুব বেশী পরিমাণে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি, রক্তস্বল্পতা দূর করা ও কোন ধরণের জীবাণুর দ্বারা সংক্রমণ হয়েছে তার চিকিৎসা করানো দরকার। সন্তান হওয়ার পর অনেক মহিলার জরায়ুর মুখে ক্ষত থাকে। এর জন্য কোন বিশেষ উপসর্গ না থাকলে চিকিৎসার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সাধারণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিশেষ করে যোনিপথের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে মোটামুটি তিন মাসের মধ্যে নিজ থেকেই সেরে যায়। তবে এর ব্যতিক্রম হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিৎ।

- পিঠে ব্যথাঃ অপুষ্টি এবং অধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত বহু সন্তানের জন্মদাত্রী মহিলাদের একটি সাধারণ কষ্ট- সারাক্ষণ পিঠে ও কোমরের ব্যথা। এ ছাড়া যোনিপথে জরায়ু বেরিয়ে আসা, জরায়ু মুখে ঘা, শ্রেণীদেশে প্রদাহ বা জরায়ুর অস্বাভাবিক অবস্থান ইত্যাদি কারণে পিঠে ব্যথা হয়। নিয়মিত পুষ্টিকর আহার, উপযুক্ত বিশ্রাম এবং ব্যায়াম অনেক ক্ষেত্রেই উপকার দেয়। অন্যথায় চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

এক্সফিন™
টারবিনাফিন

উপাদান

এক্সফিন™ ট্যাবলেট : প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে টারবিনাফিন ২৫০ মি.গ্রা. (টারবিনাফিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি হিসেবে)

এক্সফিন™ ক্রীম : প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে টারবিনাফিন ১০ মি.গ্রা. (টারবিনাফিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি হিসেবে)

ফার্মাকোলজি

টারবিনাফিন একটি অ্যালাইলএমিন জাতীয় অ্যান্টিফাংগাল যা স্কোয়ালিন ইপক্সিডেষ এনজাইমকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে ফাংগাসের কোষ ঝিল্লীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আরগোস্টেরল এর সংশ্লেষণ থামিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে কোষের ভিতরে স্কোয়ালিন এর ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং কোষঝিল্লীর প্রবেশ্যতা বেড়ে যায়। তবে এ ঘটনাটি কোষের ভেতর আরগোস্টেরলের ঘাটতির বা অভাবের কারণে ঘটেনা। দেহের বাইরে, ওষুধ এবং ফাংগাসের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে টারবিনাফিন হাইড্রোক্লোরাইড ফাংগাস নাশক হিসেবে কাজ করে। যদিও দেহের বাইরে সংঘটিত এ পরীক্ষার ক্লিনিক্যালি কোন তাৎপর্য পাওয়া যায়নি। টারবিনাফিন ট্রাইকোফাইটন মেনটাগ্রোফাইট, ট্রাইকোফাইটন রাবরাম অণুজীবের অধিকাংশ স্ট্রেইনের বিরুদ্ধেই কার্যকারিতা প্রকাশ করে। টারবিনাফিন ত্বকের স্ট্র্যাটাম করনিয়াম, নখ এবং চুলে প্লাজমা ঘনত্বের চেয়ে বেশী মাত্রায় পাওয়া যায়।

নির্দেশনা

ত্বকের ডার্মাটোফাইট জাতীয় ফাংগাসের সংক্রমনে যেমন: ট্রাইকোফাইটন রাবরাম, ট্রাইকোফাইটন মেনটাগ্রোফাইটস, মাইক্রোস্পোরাম ক্যানিস এবং এপিডার্মোফাইটন ফ্লক্কোসাম।

টারবিনাফিন ট্যাবলেট

- হাতের নখ অথবা পায়ের নখের ডার্মাটোফাইট সংক্রমণ (ওনিকোমাইকোসিস)
- রিংওয়ার্ম সংক্রমণ (টিনিয়া করপরিস, টিনিয়া ক্রুরিস এবং টিনিয়া পেডিস) যেখানে সংক্রমণের স্থান, তীব্রতা অথবা ব্যাপকতা বিবেচনা করে মুখে ওষুধ সেবন করার জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়।

টারবিনাফিন ক্রীম

- ত্বকের ইষ্ট জনিত সংক্রমণে বিশেষতঃ ক্যানডিডা প্রজাতির সংক্রমণ (যেমন: ক্যানডিডা অ্যালবিক্যানস)
- পিটাইরস্পোরাম অরবিকুলার (ম্যালাসেজিয়া ফারফার) এর কারণে সৃষ্ট পিটাইরিয়াসিস (টিনিয়া) ভারসিকালার

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

ট্যাবলেট

প্রতিটি নির্দেশনায় টারবিনাফিন ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেটের মাত্রা দিনে ১ বার। নির্দেশনা এবং সংক্রমণের তীব্রতা ভেদে চিকিৎসার সময়সীমা নির্ধারিত হবে।

নির্দেশনা	সেবনকাল
হাতের নখের ওনিকোমাইকোসিস	৬ সপ্তাহ
পায়ের নখের ওনিকোমাইকোসিস	১২ সপ্তাহ
টিনিয়া পেডিস	২-৬ সপ্তাহ
টিনিয়া করপোরিস	৪ সপ্তাহ
টিনিয়া ক্রুরিস	২-৪ সপ্তাহ

ওনিকোমাইকোসিসের ক্ষেত্রে ছত্রাক থেকে আরোগ্য এবং চিকিৎসার বিরতির কয়েক মাস পরে অনুকুল প্রভাব দেখা যায়। এটি সুস্থ নখের বিকাশের সময়সীমার সাথে জড়িত।

ক্রীম:

টারবিনাফিন ক্রীম দিনে এক থেকে দুই বার দেওয়া যায়। নির্দেশনা এবং সংক্রমণের তীব্রতা ভেদে চিকিৎসার সময়সীমা নির্ধারিত হবে। টারবিনাফিন ব্যবহারের পূর্বে আক্রান্ত স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার করে ও শুকিয়ে নিতে হবে। ক্রীমটি আক্রান্ত জায়গা ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলোতে পাতলা আবরণের মত লাগাতে হবে এবং আলতোভাবে ঘষতে হবে।

নির্দেশনা	প্রয়োগকাল
টিনিয়া পেডিস	১ সপ্তাহ
টিনিয়া করপোরিস, টিনিয়া ক্রুরিস	১-২ সপ্তাহ
কিউটেনিয়াস ক্যানডিয়াসিস	২ সপ্তাহ
পিটাইরিয়াসিস ভারসিকালার	২ সপ্তাহ

ব্যবহারের কিছুদিন পরেই রোগের লক্ষণ সমূহ থেকে উপশম পাওয়া যায়। চিকিৎসাটি অবশ্যই নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। অনিয়মিত ব্যবহার বা চিকিৎসার অকাল ব্যবহার বন্ধে রোগের পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি বহন করে। যদি ব্যবহারের দুই সপ্তাহের মধ্যে উন্নতি না হয়, তাহলে চিকিৎসাটি অবশ্যই যাচাই করতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা

টারবিনাফিন ট্যাবলেট বা ক্রীমে ব্যবহৃত যেকোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

সাবধানতা

টারবিনাফিন ক্রীম শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য। চোখের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে প্রচলিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মাথাব্যথা, উদরাময়, র‍্যাশ, অন্ত্রের অসুবিধা, যকৃতের উৎসেচকের অস্বাভাবিকতা, ফুঁসকুড়ি, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা এবং পেট ফাঁপা। এছাড়াও মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে যকৃতের বিষক্রিয়া, স্বাদের পরিবর্তন, মারাত্মক চর্মরোগ অথবা বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রবণতা দেখা যেতে পারে।

ক্রীমের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জায়গা লালচে হওয়া, চুলকানি বা যন্ত্রনা হতে পারে। লক্ষণগুলো অবশ্যই প্রতিক্রিয়া প্রবণতা থেকে আলাদা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে চিকিৎসা বিরত রাখতে হবে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

যখন মুখে খাওয়া হয়, টারবিনাফিন সাইটোক্রোম পি৪৫০ ২ডি৬ আইসো-এনজাইমের একটি নিবারণকারী এবং ডেসিপ্রামিন, সিমেটিডিন,

ফ্লুকোনাজল, সাইক্লোস্পোরিন, রিফামপিন এবং ক্যাফেইনের বিপাকে আন্তঃক্রিয়া প্রদর্শন করে। টারবিনাফিন ক্রীমের সাথে অন্যান্য ওষুধের প্রতিক্রিয়া জানা নেই।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার

টারবিনাফিন ট্যাবলেট একটি 'প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি বি' ড্রাগ। গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে তেমন কোন গবেষণা পাওয়া যায়নি। গর্ভাবস্থায় টারবিনাফিনের ব্যবহার/প্রয়োগ সুপারিশ করা হয় না। (যদি না ব্যবহারের উপকারীতা ভ্রুণের সম্ভাব্য ঝুঁকির থেকে বেশী হয়)।

টারবিনাফিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। টারবিনাফিনের অনুপাত মাতৃদুগ্ধে ৭:১ এ থাকে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে টারবিনাফিন দ্বারা চিকিৎসা সুপারিশ করা হয় না।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

ওনিকোমাইকোসিসে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে টারবিনাফিন ট্যাবলেট এর নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত নয়। শিশুদের ক্ষেত্রে টারবিনাফিন ক্রীমের নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণে সাবাধানতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে যাদের স্বল্প কার্যক্ষম বৃক্ক, যকৃত অথবা হৃদপিন্ড এবং সহগামী রোগ রয়েছে তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিম্ন মাত্রা থেকে শুরু করে মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে।

সংরক্ষণ

এক্সফিন ট্যাবলেট ৩০ সে. তাপমাত্রার নিচে এবং এক্সফিন ক্রীম ২৫ সে. তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করতে হবে। উভয়ই আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

এক্সফিন™ ট্যাবলেট : প্রতি প্যাকে আছে ১২টি ট্যাবলেট (অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকেজিংয়ে)।

এক্সফিন™ ক্রীম : প্রতি প্যাকে আছে ৫ গ্রাম ক্রীমের একটি অ্যালুমিনিয়াম টিউব।

ইসপারগুল

উপাদান

ইসপারগুল স্যাশে : প্রতিটি স্যাশেতে আছে ৩.৫ গ্রাম প্লান্টাগো ওভাটা (সিলিয়াম) হাস্ক।

ইসপারগুল কন্টেইনার : প্রতিটি কন্টেইনারে আছে ১২০ গ্রাম প্লান্টাগো ওভাটা (সিলিয়াম) হাস্ক।

বর্ণনা

প্লান্টাগো ওভাটা উদ্ভিদের খোসা ও বীজ কে সাধারণত সিলিয়াম বা ইসবগুল বলা হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য চিকিৎসায় সম্পূরক আশ হিসেবে ইসবগুল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

সক্রিয় উপাদান

ইসবগুল সহজে পানিতে জেল তৈরী করে বিধায় একে মিউসিলেজিনাস শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ইসবগুলের অন্তর্বীজ পানি ধরে রাখে বলে এটি শুষ্ক হয় না এবং সহজেই জেল তৈরী করতে পারে।

ইসবগুলে থাকে-

হেমি সেলুলোজ, অ্যারাবিনোজ, র‍্যামনোজ, গ্যালাকটিউরনিক এসিড, ৩৫% দ্রবনীয় ও ৬৫% অদ্রবনীয় পলি-স্যাকারাইড

কিভাবে কাজ করে

ইসবগুল খাওয়ার ৪ ঘন্টার মধ্যে অবিকৃত পলিমারাইজড অবস্থায় সিকামে পৌছে। এটি উল্লেখযোগ্য হারে মলের আর্দ্রতা ও ওজন বৃদ্ধি করে এবং মলের অন্ত্রীয় প্রবাহকাল কমায়। ইসবগুলে অবস্থিত দ্রবনীয় অশ্বেতসার পলিস্যাকারাইড এর অবায়বীয় গাঁজন অন্ত্রে শর্ট চেইন ফ্যাটি এসিড, এসিটেট, প্রোপিওনেট ও বিউটাইরেট উৎপন্ন করে। বিউটাইরিক এসিড কোলোনোসাইডের মধ্যে জারণ ঘটিয়ে আলসারেটিভ কোলাইটিস চিকিৎসায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ইসবগুল কোলোস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে থাকে। ধারণা করা হয় যে ইসবগুল আলফা-হাইড্রোক্সিলেজ ও এইচএমজি- কোএ রিডাক্টেজ এর ক্রিয়া বৃদ্ধি করে কোলোস্টেরল শোষণ কমায়। ইসবগুল চেনো ডি-অক্সিকোলিক ও কোলিক এসিডের অংশ বৃদ্ধি করে এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায়।

নির্দেশনা ও ব্যবহার

ইসপারগুল কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ ও আলসারেটিভ কোলাইটিসে নির্দেশিত। এছাড়া এটি হাইপারলিপিডেমিয়া, ভোজনোত্তর ডায়াবেটিস ও পেটের পীড়ায় উপকারী।

মাত্রা ও সেবনবিধি

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে : ৩.৫ গ্রাম (১টি স্যাশে অথবা এক চা চামচ পাউডার) দিনে ২ বার ১ গ্লাস পানিসহ সেব্য।

৬-১২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে : ২ থেকে ৩.৫ গ্রাম (১/২ - ১টি স্যাশে অথবা এক চা চামচ পাউডার) দিনে ২ থেকে ৩ বার ১ গ্লাস পানিতে নিয়ে ৩ থেকে ৫ সেকেন্ড নেড়ে খেতে হবে। ইসপারগুল অন্য ওষুধ গ্রহণের ৩০ থেকে ৬০ মিনিট আগে অথবা পরে খেতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও সতর্কতা

ইসবগুল সহনীয় ও নিরাপদ। সঠিক পদ্ধতিতে গ্রহণ না করলে (অল্প পানি দিয়ে খেলে) এটি ফুলে বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের খাদ্যনালী এবং অন্ত্রে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। প্যানক্রিয়েটিক ইনসাফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিৎ নয়

যাদের পরিপাকনালী অস্বাভাবিকভাবে সংকীর্ণ, অন্ত্রনালীর অবস্ট্রাকশন, গলাধঃকরণে জটিলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

যষ্ঠিমধু, বিরেচক ও অ্যান্টিডায়াবেটিক ওষুধের সাথে সমসাময়িক ব্যবহার করলে শরীরে পটাশিয়াম এবং গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। কার্বামেজেপাইন এর সাথে সমসাময়িক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্বামেজেপাইনের বায়োএভেইলিবিলিটি কমে যেতে পারে।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার

কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না।

সংরক্ষণ

সূর্যালোক থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

ইসপারগুল প্রতিটি বাক্সে আছে ১৫টি ৩.৫ গ্রাম স্যাশে এবং প্রতিটি এইচ ডি পি ই কন্টেইনারে আছে ১২০ গ্রাম পাউডার।

ব্যথা নিরাময় এবং পাকস্থলীর সুরক্ষা এখন একসাথেই!!!

Xenole®

Naproxen + Esomeprazole

৩৭৫ মি. গ্রা. ও
৫০০ মি. গ্রা. ট্যাবলেট

ভিতরের মূল উপাদান: **Naproxen**
শক্তিশালী ব্যথানাশক ওষুধ যা অস্টিওআর্থ্রাইটিস এবং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস সহ আরো বিভিন্ন প্রকারের ব্যথা ও প্রদাহ উপশম করে।

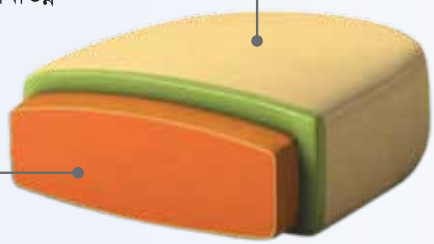

বাহিরের আবরণ: **Esomeprazole**
ব্যথানাশক ওষুধ দ্বারা গ্যাস্ট্রিক আলসার হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।

ক্ষুধামন্দা, অজীর্ণ ও বদহজমে প্রাকৃতিক সমাধান

পেপনর®

জীরকাদ্যরিষ্ট ১০০ মি.লি. সিরাপ

একটি প্রাকৃতিক হজমকারক সিরাপ

- সকল বয়সে সমানভাবে কার্যকরী
- গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য সম্পূরক পুষ্টি উপাদান
- পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন

মাত্রা ও সেবনবিধি
১২ বছরের নিচে : ১-২ চা চামচ (৫-১০ মি.লি.) দিনে ২-৩ বার সেব্য।
প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ২-৩ চা চামচ (১০-১৫ মি.লি.) দিনে ৩ বার সেব্য।

Since 1958

SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd

SQUARE

Xfin™

Terbinafine

250 mg Tablet

5 gm Cream

kills fungus, heals us

নির্দেশনা

- হাতের নখ অথবা পায়ের নখের ফাংগাস সংক্রমণে
- শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফাংগাস এর কারণে সৃষ্ট সংক্রমণে

Since 1958

SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd

SQUARE

মেডিকেল সার্ভিসেস বিভাগ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার্স: স্কয়ার সেন্টার
৪৮, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২, ফোন : ৮৮৩৩০৪৭-৫৭, ৮৮৫৯০০৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮২ ৮৬০৮, ৮৮২ ৮৬০৯
E-mail : info@squaregroup.com, Web : http://www.squarepharma.com.bd

Production: Rains.Com